إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

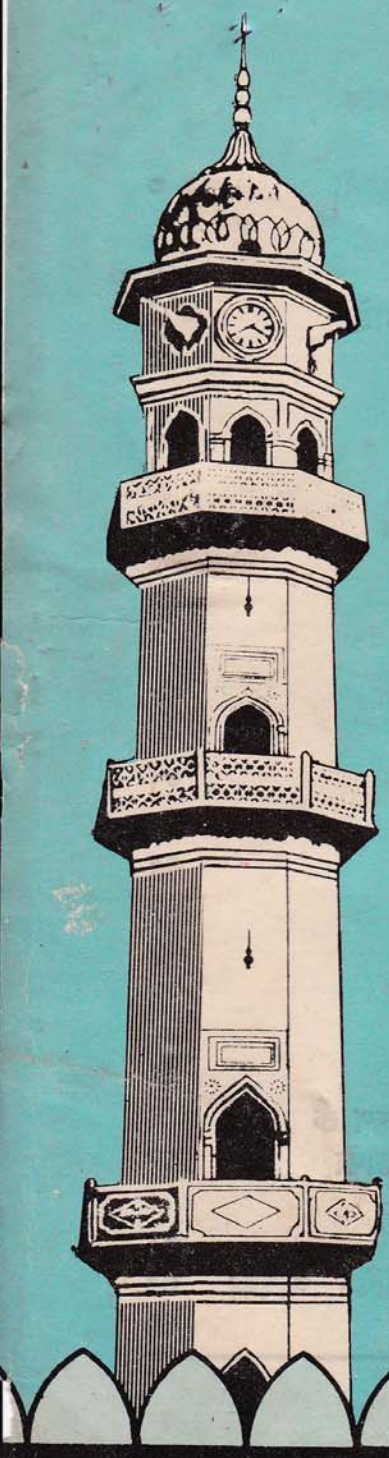

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫বর্ষ ।। ১৪শ ও ১৫শ সংখ্যা
১০ই শাবান, ১৪১২ হিঃ ।। ২রা ফাল্গুন, ১৩৯৮ বাংলা ।। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ।। ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফঃ মজলিসের আদাব
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণীঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী ৪

জুমুআর খুৎবাঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী ৬

ওয়াক্‌ফে জাদীদের নব বর্ষের (১৯৯২) ঘোষণা
অনুবাদক : জনাব নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী ১৪

ব্যবধান ও অবদান
মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ১৭

চীনে আহ্‌মদীয়াত
জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান ২৫

আহ্‌মদীয়াত একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক আন্দোলন
অধ্যাপক মোঃ মোস্তাক আহমদ ২৮

কাদিয়ানের শততম সালানা জলসা
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩৭

রাশিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা
জনাব আবদুল্লাহ শামস বিন তারিক ৪৫

মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও সোনার পিতলে কলস ৫১

ইসলামে সামাজিক জীবন
জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার ৫৩

ছোটদের পাতা
পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৫৫

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহাউদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে
হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় পবিত্র বাণী ৫৮

স্বদেশ চিন্তা
জনাব আহ্‌মদ শরীফ ৬১

হযরত মসীহ্‌-মাওউদ (আঃ)-এর ধৈর্য : জনাব শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ ৬৩

সংবাদ ৬৪

সম্পাদকীয়

যুগে যুগে মিথ্যার বেসাতি

প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে মিথ্যার বেসাতি ধর্মীয় জগতেও বিরল নয়। প্রত্যেক নবীর যুগে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাফেররা দুনিয়ার সবচে' নিষ্পাপ মানুটির বিরুদ্ধে

(অবশিষ্টাংশ ৭৯ পাতায় দেখুন)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ইং : ১৫ই তবলীগ, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ২রা ফাল্গুন, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্-বাকারা-২

২১৫। তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর এখনও তাহাদের অনুরূপ অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের (২৫৬) পূর্বে অতীত হইয়াছে? অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীত-কম্পিত করা হইয়াছিল, এমন কি (২৫৬-ক) রসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, 'কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে (২৫৭)?' স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য সন্নিকটে।

২১৬। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কি খরচ করিবে? তুমি বল, 'উত্তম ধন-সম্পদ (২৫৮) হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম এবং মিস্‌কীন, এবং মুসাফিরগণের জন্য হইবে। এবং তোমরা যে কোন পুণ্য কর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তম জানেন।'

২৫৬। ইসলামকে কবুল করা এবং ইহার বাণীকে রূপায়িত করা কুসুমাস্তীর্ণ পথে সম্ভব নহে। তাই মুসলমানকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে অগ্নি-পরীক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিতে করিতে মহোত্তম পূর্ণতা অর্জন করিতে হইবে।

২৫৬-ক। হাত্তা অর্থ এমনকিও হয় (মুগনী)। শব্দটি এই অর্থে ৬৩:৮ এ ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৫৭। সাহায্যের জন্য মর্মবিদারী যে করুণ প্রার্থনা—'কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে' কথাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে কাতরতা থাকিলে নৈরাশ্য বা হতাশা নাই। আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁহার সত্যিকার অনুসারীদের নৈরাশ্যে পতিত হওয়া অসম্ভব ও ধারণাতীত (১২:৮৮)। এই বাক্যটিও একটি সকাতর সানুনয় প্রার্থনা, যাহাতে আল্লাহ্‌র করুণা উদ্বেলিত হইয়া সাহায্যের আকারে নামিয়া আসে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২১৭। তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল অথচ উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, (২৫৯) কিন্তু ইহা খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন বস্তুকে ঘৃণা কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং ইহাও সম্ভব যে, তোমরা কোন জিনিসকে ভালবাস, অথচ উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না। ২৬ রুকূ

২১৮। তাহারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, উহাতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায়, এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা এবং মসজিদুল হারাম হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং উহার অধিবাসীকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র (২৬০) দৃষ্টিতে সর্বাধিক অন্যায়; আর ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।' যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইত। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নিজ দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যাইবে সেই ক্ষেত্রে ইহারাই এমন লোক যাহাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হইবে। এবং ইহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে।

২৫৮। এইখানে বলা হইতেছে যে, তাহারা যাহা ব্যয় করিবে, উহা প্রথমে সৎভাবে উপার্জিত হওয়া চাই। যাহা দান করা বা খরচ করা হইবে, উহা ভাল হওয়া চাই অর্থাৎ গ্রহীতার কাছে গ্রহণীয় হওয়া চাই ও তাহার প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী হওয়া চাই। যে উদ্দেশ্য এইরূপ খরচের পিছনে কাজ করে, সেই উদ্দেশ্য সৎ ও প্রশংসনীয় হওয়া চাই।

২৫৯। মুসলমানেরা যুদ্ধ করা অপসন্দ করিতেন। তবে এই অপসন্দ তাঁহাদের ভীতির কারণে নহে, বরং মানুষের রক্তপাত ঘটানোকেই তাহারা অপসন্দ করিতেন। অপসন্দের অন্য কারণটি ছিল এই যে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইসলামের প্রচার ও বিস্তৃতির যে সুযোগ-সুবিধা থাকে, যুদ্ধাবস্থায় উহা ব্যাহত হইয়া যায় এবং বিরূপ মনোভঙ্গী বাড়িয়া যায়।

২৬০। বিশ্বাসীগণকে বলা হইতেছে যে, অবিশ্বাসীরা যদি পবিত্র মাসগুলির পবিত্রতা নষ্ট করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অবিশ্বাসীগণও যেন পবিত্র মাসেই তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে ইতস্ততঃ না করে। কারণ একমাত্র এইভাবে পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব (২:১৯৫)। তফসীরকারকগণ সাধারণভাবে বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে হাদীসও রহিয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) একবার মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী একদল কুরাইশের খবরাদি নিবার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন জাহ্‌শকে পাঠাইলেন। তখন তাহারা একটি ক্ষুদ্র দলের সন্ধান পাইলেন। আবদুল্লাহ দলটিকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং একজনকে হত্যা ও অপর দুই জনকে বন্দী করিলেন। এই ঘটনা কোন্‌ তারিখে ঘটিয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। কেহ বলেন ঐ দিনটি পবিত্র মাসেরই একটি দিন ছিল, অন্যেরা তাহা স্বীকার করে না। এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে কুরাইশগণ তারিখটির সন্দিগ্ধতার সুযোগ নিয়া প্রতিবাদ উঠাইলেন যে, মুসলমানেরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করিয়াছে এবং ইহার পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে। এই আয়াতটি ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

মজলিসের আদাব

কুরআন,

يايها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ج
واذا قيل انشزوا فانشزوا (المجادلة ايت ١٢)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, তোমরা মজলিসে প্রশস্ত হয়ে বস তখন তোমরা প্রশস্ত হয়ে বসো। আল্লাহ তোমাদিগকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হয় তোমরা উঠ তখন তোমরা উঠে পড়ো। (সূরা মুজাদলা : ১২ আয়াত)

হাদীস :

عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس و جلسنا حوله
كان على رؤسنا الطير (نسائى)

অর্থাৎ হযরত বরা' (রা:) বর্ণনা করেন। আমরা হযরত রসূল করীম (সা:)-এর সাথে বাইরে গেলাম যখন তিনি বসলেন আমরাও তাঁর চারিদিকে বসে গেলাম। আমরা এরূপ চুপ ছিলাম যেন আমাদের মাথার উপরে পাখী রয়েছে (যারা শব্দ শুনে উড়ে যাবে।)

ব্যাখ্যা :

ইসলামী সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্যে ইহা প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দান করেছে। মজলিসের আদব তন্মধ্যে একটি। উপরোক্ত হাদীসে যেখানে একদিকে হযরত রসূলে করীম (সা:)-এর মর্যাদা ও সম্মান যা সাহাবাদের হৃদয়ে ছিল সেদিকে আলোকপাত করে সেখানে মজলিসের আদব সম্বন্ধেও আমাদের অবগত করে। মজলিসের আদব সব জাতি ও ধর্মে পাওয়া যায়। ইসলামী শিক্ষা এই যে, মজলিসে আদবের সাথে এভাবে বস যেন অন্য লোকও এসে বসতে পারে আর যখন মজলিসে বসে পড় তখন চুপ করে বসে কান পেতে বক্তব্য শুনো। হযরত রসূল করীম (সা:) এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সম্বন্ধে আলোচনা হয়, এর ব্যাপারে বলেছেন যে, ফিরিশ্‌তারা তাদের পাখা দ্বারা সেই মজলিসকে ঘিরে ফেলে এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দোয়া করে ও আল্লাহর নিকট তাদের ক্ষমার জন্যে সুপারিশ করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা:) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি বক্তব্য রাখার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন শ্রোতাদের কর্তব্য তার দিকে মুখ করে নিরবে যেন বক্তব্য শুনে। এবং বক্তব্যের মধ্যে হট্টোগোল না করে। (আহ্‌মদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম পুস্তক ২০১-২০২ পৃ:)

সুতরাং আমাদের কর্তব্য আমরা যেন নিজেদের জীবনে ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করে খোদাতা'লা ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করি।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী।

ঐশী কাজ বন্ধ হতে পারে না

হুযুর বলেন, ইহা ঐশী কাজ আর ঐশী কাজ বন্ধ হতে পারে না—এ ব্যাপারে আমার মনে আদৌ কোন সন্দেহ নেই।

হুযুর বলেন, মানুষের গালিতেও আমার নফস উত্তেজিত হয় না—

পুনরায় বলেন, ধনীদের মধ্যে অহংকার থাকে কিন্তু ইদানিং কালের ওলামাদের মধ্যে অহংকারের মাত্রা তার চেয়েও বেশী। তাদের অহংকার তাদের জন্য প্রাচীরের মত প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। আমি এই প্রাচীর ভাংগতে চাই। যখন এই প্রাচীর ভেংগে যাবে তখনই তারা বিনয়ের সাথে ফিরে আসবে।

খোদাতা'লার মহত্বকে স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত থাক

হুযুর বলেন, আল্লাহ্তা'লা মুত্তাকীকে স্নেহ করেন। খোদাতা'লার মহত্বকে স্মরণ করে ভীত থাক এবং স্মরণ রাখবে যে, সকলেই আল্লাহ্তা'লার বান্দা। কারো উপর যুলুম করবে না, উত্তেজিত হবেনা এবং কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করবেনা। জামাতে যদি একজন অপবিত্র ব্যক্তি থাকে তাহলে সে সকলকে অপবিত্র করে দেয়। যদি তোমাদের উত্তেজিত হওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে নিজের অন্তরকে যাচাই করে দেখবে যে, এই উত্তেজনা কোন্ উৎস থেকে নির্গত হয়েছে। এই অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল।

ডিসেম্বর ১৮৯৭ :

দারুল আমান কাদিয়ান থেকে পোষ্ট কার্ড মারফত জানা গেছে যে, আমাদের জামাত প্রত্যেক নামাযের শেষ রাকাতে রুকূর পরে যেন নিম্নলিখিত দোয়া অগণিত সংখ্যায় পাঠ করে :

ربنا اٰتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاٰخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار

(সূরা বাকারা : ২০২ আয়াত)

জলসা সালানায় হযরত আকদাসের প্রথম বক্তৃতা তাকওয়া সম্পর্কে উপদেশ—২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৭

আমাদের জামাতের মঙ্গলার্থে তাকওয়া সম্পর্কে উপদেশ দেয়াকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করি। কেননা বুদ্ধিমানদের নিকট ইহা অতি পরিষ্কার যে তাক্‌ওয়া ছাড়া অন্য কোন কিছুতে আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা সঙ্গে আছেন তাহাদের যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎ কর্মশীল। সূরা নহল : ১২৯)

বিশেষ করে জামাতে আহমদীয়ার তাকওয়ারই প্রয়োজন

আমাদের জন্য বিশেষ করে তাকওয়ার প্রয়োজন এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে এবং এমম এক ব্যক্তির বয়াত করেছে যে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী রাখে। (তাদের বয়াত করার উদ্দেশ্য হলো) যেন তারা যে সব ঘৃণা, ঈর্ষা ও শির্‌কের মধ্যে লিপ্ত ছিল অথবা প্রার্থিবতায় প্রভাবিত ছিল, এসব বিপদাবলী থেকে নিস্তার লাভ করে।

আপনারা জানেন যে, যদি কেহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়; ছোট কিম্বা বড় যদি এর জন্য ঔষধ ব্যবহার না করা হয় বা কষ্ট করে চিকিৎসা না করায় তাহলে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে না। মুখে একটি কাল দাগ দেখা দিলে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, দাগ বাড়তে বাড়তে সমগ্র চেহারাকে ছেয়ে না ফেলে। অনুরূপভাবে পাপেরও একটি কাল দাগ রয়েছে যা অন্তরে বড় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। ছোট ছোট পাপই সেই ছোট দাগ যা বৃদ্ধি পেতে পেতে সমস্ত চেহারাকে কাল করে ফেলে।

আল্লাহ্‌তা'লা যেমন রহীম ও করীম তেমনি তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং শাস্তি দাতাও বটেন। যখন খোদাতা'লা দেখেন যে, কোন জামাত অনেক বড় বড় দাবী করছে কিন্তু কার্যতঃ তাদের নমুনা ভিন্ন ধরণের তখন তার রুদ্রতা ও ক্রোধ বেড়ে যায়। এমন জামাতকে শাস্তি দেয়ার জন্য খোদাতা'লা কাফেরদের নিযুক্ত করেন। যারা ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা জানেন যে, বেশ কয়েকবার মুসলমানেরা কাফেরদের তলোয়ারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল। যেমন, চেংগীয খান ও হালাকু খান মুসলমানদের ধ্বংস করেছিল। অথচ আল্লাহতা'লা মুসলমানদেরকে সমর্থন ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবুও মুসলমানগণ পরাভূত হলো। এ ধরণের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে আর তার কারণ হলো, আল্লাহতা'লা দেখেছিলেন যে, মুখে তারা لا إله إلا الله বলে কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ অন্য দিকে ঝুঁকে রয়েছে এবং কার্যতঃ তারা পার্থিবতায় লিপ্ত। সুতরাং তাঁর শাস্তি নিজস্ব রূপ দেখাতে আরম্ভ করে।

(মলফুযাত : ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯, ১০, ১১)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[১৮ই অক্টোবর, ১৯৯১ ইং লণ্ডন মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

(১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম
সদর মুরব্বী

তাছাড়া, এই ভাষাগুলোর কোন একটি না জানলেও, আমার যাচাই অনুসারে অধিকাংশ রাজ্যের রাজধানীতে সকল প্রকারের অনুবাদক পাওয়া যায় এবং ভাল ও অভিজ্ঞ অনুবাদক অল্প টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়। উযবেকিস্তান, বোখারা ও সমরকন্দের এলাকায় অনেক অভিজ্ঞ উর্দু বিশারদ রয়েছেন, যারা রেডিও টিভিতেও উর্দুতে বক্তৃতা করেন। এবং কিছু উর্দু বিচিত্রাও প্রকাশ করেন। এই ধরণের লোক সেখানে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তাদের যোগ্যতাকে স্বল্প পয়সার বিনিময়ে আপনি কাজেও লাগাতে পারেন। একাধিক ভাষা জানেন এমন লোকও অনেক রয়েছেন। ২, ৩, ৪টি প্রাচ্য ভাষা জানেন, এমন লোকও রয়েছেন যারা সর্বত্র উপকারী সাব্যস্ত হতে পারেন। অর্থাৎ যদি কোন উর্দু ভাষাভাষী পাকিস্তানী সেখানে যান, তাহলে এমন লোকেরা উর্দু ভাষাকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদও করতে পারেন। যদি কোন আরব আহমদী সেখানে যান, তাহলে তারা আরবী হতে তুর্কী, ফারসী বা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন। ভাষার দিক থেকে, এই কথাটি আমার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। আমার ধারণা ছিল যে, রাশিয়ায় এক দুই ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার প্রতি লোকের তেমন ঝোঁক নেই। কিন্তু আমাদের এই যুগের প্রথম রাশিয়ান আহমদী মিঃ রাভীল সাহেব, যিনি একজন অত্যন্ত যোগ্য মানুষ, (ইদানিং তিনি এখানেই আছেন) তিনি নিজের জীবনের বেশীর ভাগ সময় আহমদীয়তের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছেন। তাঁর সম্পর্কে একথা জেনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম যে, তিনি পাঁচটি ভাষা অত্যন্ত ভালভাবে জানেন। প্রাচ্যের ভাষাগুলোর মধ্যে রাশিয়ান ভাষায় তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। কবিতা নাটক এবং কলাম লেখক তিনি। তাছাড়া, হাংগেরী ভাষা তিনি এত ভাল জানেন যে, বি, বি, সি হাংগেরী ভাষার প্রোগ্রামের জন্য তাঁকে বেছে নিয়েছে। বি, বি, সি হাংগেরী জাতিকে যেই সংবাদ পরিবেশন করতে চায়, তার দায়িত্ব আজকাল তাঁর উপর ন্যস্ত, যদিও প্রোগ্রাম বাণীর আকারে হয় না। কিন্তু বি, বি, সি অন্যান্য ভাষায় যখন কোন প্রোগ্রাম করে, তখন সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোকে ইংল্যাণ্ড যা বলতে চায়, তা সেই জাতিগুলোর ভাষায় পৌঁছানোই উদ্দেশ্য হয়। প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর রচনা লিখিয়ে, তারা নিজেদের

ইচ্ছামত অত্যন্ত উত্তমভাবে তাদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়। রাভীল সাহেব যার কথা আমি উল্লেখ করেছি, তিনি যে কত বড় বিশেষজ্ঞ তা আপনি এই কথা হতে ধারণা করতে পারেন। বি, বি, সি এমন অনুবাদকের সন্ধানে থাকে যাদের অনুবাদ অত্যন্ত উচ্চমানের হয়। সেই বি, বি, সি তাকে হাংগেরী ভাষায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বেছে নিয়েছে। আরও অনেক ভাষা তিনি জানেন। কিন্তু পাঁচটি ভাষার কথা তিনি আমার কাছে উল্লেখ করেছেন যেগুলির একটি হতে অন্যটিতে তিনি অনায়াসে ও বিনা কষ্টে সাবলীলভাবে অনুবাদ করতে পারেন। সে কারণে বলছি যে, উযবেকিস্তান প্রভৃতি স্থানে এ ধরণের লোক অনেক সংখ্যায় রয়েছেন যারা বহু ভাষা জানেন। সেজন্য, যে আহ্‌মদী উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না, সে উযবেকিস্তানে সম্পূর্ণভাবে একা হবে না। কেননা, সেখানে সে অবশ্যই এমন লোক পাবে যে তার কথার অনুবাদ করতে পারবে। অন্যান্য স্থানেও অনুসন্ধানে এমন লোক পাওয়া যাবে। সুতরাং যারা নিজেদেরকে রাশিয়ার জন্য পেশ করতে চান তারা ভাষা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সুতরাং যারা ব্যক্তিগত খরচে রাশিয়াতে দুই সপ্তাহ, একমাস বা দুই মাস অতিবাহিত করার সামর্থ্য রাখেন, তারা রীতিমত তাহ্‌রীকে জাদীদের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা তাদেরকে পথ দেখাবো। যে সকল এলাকায় যেতে হবে, সে সব এলাকার চাহিদা তাদেরকে জানাবো, যা পূরণ করতে হবে। যেহেতু অনেক এলাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে জন্য ঐ সমস্ত লোকদের সাথে এমন ভাইদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া কঠিন নয়। তারা এই সমস্ত ভাইদের তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরকে সাহায্যও করবেন। যদিও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করবেন, তথাপি বলতে চাই, রাশিয়ান জাতি বেশ অতিথিপরায়ণ। সে জন্য তারা নিজে না খেয়েও মেহমানদের খেয়াল রাখবেন। এ ব্যাপারে, অনেকের কিছু ভুল ধারণা আছে যাহা আমি দূর করতে চাই। দ্বিতীয় কথা হলো, যখন আমরা 'রাশিয়া' শব্দটি বলি বা 'রাশিয়ান' বলি, তখন বহির্বিশ্বে বিশেষ করে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে ইহার অর্থ হয় U. S. S. R অর্থাৎ Union of Soviet Socialist Republic. কিন্তু যে বড় দেশটিকে আমরা রাশিয়া বলি, সেখানে গিয়ে যখন আপনি 'রাশিয়া' বলেন, তখন সকলেই রাশিয়া বলতে ইউরোপিয়ান প্রজাতন্ত্র রুশকে বুঝে। U. S. S. R এর সব চেয়ে বড় প্রজাতন্ত্রের নাম রুশ বা রুশিয়া। আর তার অধিবাসী ইউরোপীয়। এখানে রাশিয়ান জাতিও রয়েছে; এবং ষ্ট্যালিনের সময় কিছু কিছু মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে মানুষকে ধরে নিয়ে এসে এখানে বসতি স্থাপনে বাধ্য করা হয়েছে, এমন সব লোকও আছে। তাদের মধ্যে তাতারীরাও রয়েছে। কাযাখ শহরে অনেক বড় সংখ্যায় তাতারী বসবাস করে। সুতরাং রুশদেশে যদিও অন্যান্য জাতিরাও রয়েছে, তবুও রুশের অধিকাংশ অধিবাসী ইউরোপীয়। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র হলো রুশ। আয়তনের দিক থেকে এত বড় যে, উহা একাই U. S, A থেকে বড় হবে

বা তার কাছাকাছি হবে। সুতরাং, 'রুশ' শব্দ U. S. S. R এর শুধু ইউরোপীয় অংশের জন্যই প্রযোজ্য না। আপনি প্রবাসী হিসেবে যদি অজ্ঞাত থাকেন এবং অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের লোকদের 'রুশীয়' বলে সম্বোধন করেন, তাহলে তারা রাগও করতে পারে এবং আক্রমণও করতে পারে। কেননা, ইদানিং রুশ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলো মারাত্মক শত্রুতা ছড়াচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ানকভাবে ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিন্তাবিদেরা সেখান থেকে ফিরে এসে, ওখানকার পরিস্থিতির উপর যে সব রচনা লিখেছেন, তা পাঠে জানা যায় যে, কোন কোন এলাকায় ভয়ানক ধরণের হিংসা বিরাজ করছে। ইতিপূর্বে রাস্তায় স্থানে স্থানে বোর্ডের উপর 'রুশী' লেখা দেখা যেতো বা পথপ্রদর্শনের খাতিরে রাস্তাঘাটে রুশী শব্দ ব্যবহার করা হতো। ঐ সকল বোর্ড এখন সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সর্বত্র রুশী শব্দ পরিবর্তন করে স্থানীয় ভাষার শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, দোকানের জন্য লেখা হত MAGAZIM বা মেগাসান (সঠিক উচ্চারণ মনে নেই) ব্যবহার করা হতো। যথা সম্ভব ফ্রেঞ্চ ভাষায়ও দোকানের জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বোখারা, সমরকন্দ ও তাশকন্দ প্রভৃতি এলাকায় এই শব্দের পরিবর্তে এখন দোকান লেখা হয়েছে। প্রসংগতঃ আপনাদের ইহাও বলে দিই যে, পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলোতে যে সমস্ত স্থানীয় ভাষা ব্যবহৃত হয় সেগুলো যদি আপনি মনোযোগ সহকারে শুনেন তাহলে জানা যাবে, সে সকল ভাষায় এমন অনেক শব্দ রয়েছে যা উর্দুতে ব্যবহার করা হয়, সামান্য উচ্চারণের পার্থক্য রয়েছে মাত্র। যে সমস্ত রাশিয়ান মেহমান জলসায় এসেছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল আর অনুবাদের পূর্বেই আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি যে, "আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি; আপনারা এই কথা বলেছেন, আমি তার উত্তর দিচ্ছি।" তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করতো, 'আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন।' তখন আমি তাদেরকে বললাম যে, আপনাদের ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যা উর্দুতে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'দোকান' যাকে আপনারা 'দোক্‌কান' বলে থাকেন কিন্তু শব্দটি দোকানই। আরও অনেক শব্দ রয়েছে। যেই বিষয়ে কথা হচ্ছিল তা আমার জানা ছিল, সে জন্য দু'চার শব্দ শুনেই বুঝা যেতো তারা কি বলতে চায় বা কি জিজ্ঞেস করতে চায় এবং ধারণা সঠিকই হতো। সুতরাং পাকিস্তানী, হিন্দুস্থানী বা অন্য কোন উর্দু ভাষী বন্ধু যদি রাশিয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন বা উল্লেখিত এলাকাগুলোতে যেতে পারেন, তাহলে আমি বিশ্বাস রাখি যে, কিছু দিনের ভিতর তারা নিজেরাই ভাষা শিখবার যোগতা অর্জন করবেন। এতদ্‌সংগে ওয়াকেফীনদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা সেখানে যাওয়া মাত্রই যেন ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে যান। শুধু গলিতে কথোপকথন বা পথ চলতে গিয়ে আলাপের মাধ্যমে ভাষা শিখলে হবে না। বরং ভাষা-শিক্ষা ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হতে হবে। ভাষাও শিখবেন, সাথে সাথে তবলীগও করবেন। তাতে অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে ধর্মীয় কথাবার্তারও সুযোগ পাবেন। এইভাবে উভয় কাজ হবে। এক ঢিলে দুই পাখী শিকার হবে। সুতরাং

আমাদেরকে এখন সংগ্রামের জন্য সারিবদ্ধ হতে হবে। অসংখ্য আহ্‌মদীর প্রয়োজন আছে যারা ঐ সকল নূতন এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হবে, যেখানে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। সেখানে তারা ছোট ছোট মক্তব বানাবে। স্থানীয় লোকদের নামায শিখাবে। দোয়া করা শিখাবে এবং দরস জারী করবে। যেভাবে অতীতকালে ওলীউল্লাহ্‌গণ দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে তবলীগের কাজ করেছিলেন, তারাও ঠিক পূর্বেকার ওলী-আল্লাহ্‌গণের পন্থা অবলম্বনে. পুনরায় এই জাতিগুলোর মধ্যে ইসলাম প্রচার করবে।

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তবলীগের আবশ্যকতা এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কেই উদাসীন। নিজেদের মুসলমান বললেও, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কোন জ্ঞান তাদের নেই। তারা ইসলামকে একটি গোষ্ঠি বা জাতী হিসেবে মনে করে। অত্যন্ত বিপজ্জনক কথা এই যে, এমন কিছু দেশ সেখানে পৌঁছছে, যারা নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকেই ইসলামের সেবা ও খেদমত বলে মনে করে। টাকা নিয়ে, তাদের কাজে লাগা, ইহাই স্থানীয় লোকেরা যথেষ্ট মনে করবে আর ইসলামকে একটি গোষ্ঠিই জ্ঞান করবে। রাজনৈতিক কার্যক্রমে তারা এ ধরণের ধ্যান-ধারণাকে ব্যবহার করছে। যারা কার্যতঃ খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত তারা ইসলামী শিক্ষার প্রতি উৎসাহী হলেও এই ধরণের শিক্ষা দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। যেই বস্তুকে তারা পানি মনে করে পান করছে, উহা প্রকৃত পক্ষে পানি নয়, বিষ। সুতরাং এমন ভ্রান্ত বস্তু সেখানে পৌঁছে তাদের পিপাসাকে বিকৃত করার পূর্বেই, অসংখ্য আহ্‌মদীকে জীবন সুধা নিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে এবং ইসলামকে প্রকৃত ইসলামী ভঙ্গীতে সত্যিকার ইসলামরূপে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এভাবেই তাদের ধর্মীয় পিপাসাকে সঠিক ইসলামের অমৃত-ধারা দ্বারা মিটাতে হবে। ইহা দুই একজনের কাজ নয়। এ কাজে শত শত লোকের প্রয়োজন। আমি মনে করি ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত হলেও এবং অনুবাদক পাওয়া না গেলেও, আহমদীরা যদি বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দুই সপ্তাহ বা ১ মাস দোয়া করার উদ্দেশ্যে আস্তানা গাড়ে মানুষকে নিজের দিকে ডাকে, ইংগিতে নামায পড়া শিখায়, এবং ইশারা ইংগিতে যতটুকু সম্ভব তাদেরকে পুণ্যের দিকে ডাকার চেষ্টা করে, দোয়া শিখায়, দোয়া করে দেখায় এবং ইংগিতে তাদেরকে নিজের উদ্দেশ্য বুঝানোর চেষ্টা করে, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেহেতু এই কাজ তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করবে, সে জন্য খোদাতা'লা সে সব ভাষাহীনদের মাধ্যমেও লোকদের প্রভাবিত করবেন। প্রভাবিত করার জন্য কোন ভাষার প্রয়োজন হয় না। এমনিতেই মানুষের অন্তরে প্রভাব ঘর করে নেয়। চাহিদা অনেক বেশী, আর সময় অত্যন্ত সীমিত। কেননা, যে সব সংবাদ আসছে, তা অত্যন্ত ভয়ানক। দুই প্রকারের প্রভাব সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্ব ইউরোপে ও রাশিয়ায় বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথমটি হলো, খৃষ্টান ধর্মের চর্চা। অগণিত সংখ্যায় পুরানো গির্জাগুলোর সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হচ্ছে। ঐগুলোর বাহ্যিক সৌন্দর্য দ্বারা

মানুষকে আকর্ষণ করার প্রচেষ্টার কর্মসূচী অতি দ্রুত গতিতে চলছে। দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টান ধর্মের নামে প্রচুর আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য আসছে। তাছাড়া, পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে একমত ও এক জোট হওয়াকে গর্বের বিষয় জ্ঞান করা হচ্ছে। তারা মনে করেছ যে, পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর সাথে যাদের বন্ধুত্ব বেশী হবে, তারাই বেশী উপকৃত হবে। এই ধ্যান-ধারণাই আজ সেখানে বিরাজ করছে। যার ফলে খৃষ্টানেরা সুযোগ লুফে নিচ্ছে। এমতাবস্থায়, আমাদেরকেও ইহার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। তাছাড়া, আর একটি ভয়ানক বিষয় হলো, পশ্চিমা জীবন-পদ্ধতি, হাবভাব, ধ্যান ধারণা ও কুসংস্কার অতি দ্রুত সেখানে প্রবেশ করছে। তারা মনে করে স্বাধীনতার মর্ম হলো, যাচ্ছে তাই কর, ইচ্ছামত কুকর্ম কর, ভোগ বিলাসে একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর। অপরাধ প্রবণতা গত এক বৎসরে এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যারা রাশিয়া গিয়েছে তারা ফিরে এসে বর্ণনা করছে যে, কোন কোন এলাকা এখন চিনা যায় না। চিন্তা করা যেত না যে, রাস্তাঘাট এমন নিরাপত্তা হীন হয়ে পড়বে। আমাদের রাভীল সাহেব যে সকল বিবরণ দিয়েছেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, খৃষ্টান ধর্ম এই বিষয়গুলোর সাথে নিবীড়ভাবে জড়িত। অর্থাৎ কুকর্ম ও খৃষ্টান ধর্ম হাতে হাত রেখে, সেখানকার রাস্তাঘাটে ঘুরা ফিরা করছে। একে অন্যের প্রতি ঘৃণার লেশমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। তাছাড়া, খৃষ্টান ধর্ম প্রদত্ত স্বাধীনতার কারণে পাপের প্রতি আকর্ষণ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছেই। তারা বলে, খৃষ্টান নাম ধারণ করে গীর্জায় যাও, তারপর যা ইচ্ছে কর; যেমন খুশী জীবন যাপন কর কিছু যায় আসে না, তোমরা নিষ্পাপ। এই নমনীয়তা খৃষ্টান ধর্মের প্রতি মানুষের মনে অধিক আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। তার মোকাবেলায়, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাদাতাদেরকে একটি ভিন্ন জীবনের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়। তাদের উপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং বলে তোমরা ইহা করোনা, উহাও করো না; নিজেদের আবেগ সংযত কর, স্বীয় ধ্যান ধারণাকে সংবরণ কর, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন কর। এ কারণে প্রাথমিকভাবে মানুষ বড় অস্বস্তি ও কুণ্ঠা বোধ করে। নিরানন্দ ও একঘেঁয়ে মনে করে। মানুষ বলে, কি ব্যাপার? কি ধরণের লোক আমাদের কাছে এলো? আমরা স্বাধীনতার দিকে যাচ্ছি। আর সে বলে ইহা করোনা উহা করোনা; ইহা কর, উহা কর। বাহ্যতঃ এই সংগ্রাম একটি Unequal Fight অর্থাৎ একটি অসম সংগ্রাম। বাহ্যতঃ সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব খৃষ্টানদের ও সকল প্রকারের দোষ ইসলামের। তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেছি যে, ইসলামের একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। তা হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের শক্তি, তাহলো সত্যের শক্তি, যা অবশ্যই বিজয়ী হবে। যদি মুত্তাকীরা ইসলামের পয়গাম নিয়ে সেখানে যায় এবং নিজের সুউচ্চ নমুনা দ্বারা যদি আধ্যাত্মিক জীবনের মর্ম ও সার্থকতা তাদেরকে বুঝায়, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে, সেখানে পিপাসার্ত লোক রয়েছেন। খৃষ্টানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, মুসলমানদের মধ্যে মোকাবেলা করার শক্তি ও ধ্যান-ধারণা অধিক জাগ্রত হচ্ছে। আমাদেরকে এই সুযোগটি

কাজে লাগানো উচিত। ইতোমধ্যে যে সকল লোক পূর্বাঞ্চলের প্রজাতন্ত্রগুলো দৌড়া করেছে, তাদের প্রবন্ধাবলী হতে বুঝা যায় যে, সেখানে পাশ্চাত্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। লিখকেরা লিখেছেন যে, অনেক মুসলমান যাদের ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক ছিলনা বা যারা এখনও জানেনা যে, ইসলাম কাকে বলে, তারা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মসজিদে যাওয়া আরম্ভ করেছে। কোন কোন স্থানে মসজিদের সৌন্দর্য এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এক বৎসর পূর্বে যেখানে এক ব্যক্তি যেতো সেখানে এখন ১০ জন যায়। সুতরাং খৃষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় অতি দ্রুত পাশ্চাত্য রীতি-নীতি নোংরামী ছড়ালেও, পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলোতে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদের জন্য একটি ভাল ও অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য, এখন ভাষা-বিদ আলেম ও ট্রেইনিং প্রাপ্ত মুরব্বী প্রস্তুত করে পাঠানোর অপেক্ষা করার মত সময় আমাদের নেই। এখন সময়ের গুরুত্ব বিভিন্ন ধরণের। এখন আমরা এমন একটি সময়ে উপনীত হয়েছি, তখন যা কিছু আছে, তা নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কখনও কখনও বাচ্চাদেরকেও ময়দানে পাঠাতে হয়। ইরাক-ইরানের যুদ্ধে এমন একটি সময় এসেছিল, যখন ইরানের শিবিরে প্রাপ্তবয়স্ক যোদ্ধার ঘাটতি ছিল। তখন তারা বয়সের মান শিথিল করে বয়স সীমা নীচে নামিয়ে আনে এবং অবশেষে, এমন সময় এলো যখন যুদ্ধ-ময়দানে পাঠানোর জন্য তারা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের একত্রিত করে। টি, ভিতে এমন দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। মায়েরা হায় হুতাশ করছে। আর তাদের বাচ্চাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মায়েদেরকে এই উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা কেন কাঁদছ? আমরা তাদেরকে শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করছি তাদের স্থায়ী জীবন দেয়া হবে। এই দৃশ্যও দেখা গিয়েছে যে, কিছু ইরানী মায়েরা স্বয়ং নিজের সন্তান পেশ করেছেন। এ অত্যন্ত কৃতকার্যতার সাথে এই প্রপাগাণ্ড করা হয় যে, যারা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে, তারা প্রকৃত পক্ষে কুফরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদি সে মারা যায়, তাহলে শহীদ হবে। কিছু ভাল কিন্তু বোকা মায়েরা নিজেদের বাচ্চাকে সৈন্যের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই যুদ্ধ অজ্ঞদের যুদ্ধ ছিল, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইহা ইসলামের শত্রুতা; উভয় পক্ষেই ইসলামের শত্রুতা বিরাজ করছিল। তা সত্বেও ইসলামের নাম ব্যবহার করার কারণে কোন কোন মা নিজের ছোট বাচ্চাদেরকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন।

আমি যেই যুদ্ধের দিকে ডাকছি, তা ইসলামী যুদ্ধ, খাঁটী ইসলামী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আহ্‌মদীয়া জামাত ছাড়া আর কেউ করবে না। অন্য কাউকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। সে কারণে, আজ সর্ব প্রকারের মান শিথিল করা হলো। যে ধরণের আহ্‌মদীই হোক, যে কেউ পারে, এই সকল এলাকায় চলে যাক। তাদের চলে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে বসে শুধু দোয়া করাকেই খোদাতা'লা বরকতমণ্ডিত করবেন। ইহা নূতন কিছু নয়, কোন কোন এলাকায় ইসলামের বিজয় এইভাবে শুধু বুযুর্গদের দোয়ার ফলেই হয়েছে।

সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো দোয়া। দোয়াই সেই অস্ত্র যা এরূপ অসম যুদ্ধে দুর্বলদেরকে শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবে। এ সব ক্ষেত্রে দুর্বলের বিজয় রহস্য দোয়া ছাড়া আর কিছু নয়। নতুবা ইহা প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত হবে। কেননা, দুর্বল ও শক্তিশালীর মধ্যে সংঘর্ষে, দুর্বল সদা পরাভূত হয় এবং অবশ্যই মার খায়। শুধু ধর্মীয় জগতে, দুর্বল-সবলের যুদ্ধে, সবলকে দুর্বলেরা পরাস্ত করে। কবিদের দুনিয়াতে শ্যান পাখি মমোলার (মমোলা চড়ুই জাতীয় অতি ক্ষুদ্র পাখী) সাথে যুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু ইহা কবির কথা। তার চেয়ে বেশী ইহার কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু ধর্মীয় দুনিয়াতে কার্যতঃ ইহা ঘটে থাকে। মমোলা (চড়ুই জাতীয় পাখি) বাজ পাখীর ডানা ভেংগে দেয় এবং তার সৈন্যদলকে সার্বিকভাবে পরাজিত করে। যদি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে সেই মোকাবেলা পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে সত্যিকারেরই একদিকে মমোলা (চুড়ুই জাতীয় পাখি) এবং অন্যদিকে শ্যান পাখিই পরিলক্ষিত হয়।

রোম এবং পারস্যের বাদশাহদের সাথে সীমিত কয়েকজন মুসলমান মুজাহেদের সংঘর্ষ হয়। এমন কিছু যুদ্ধও হয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে জেহাদ আখ্যা পেতে পারে না।

কিন্তু সেই যুদ্ধগুলোতে ধর্মীয় প্রেরণার প্রাধান্য ছিল, ধর্মীয় চেতনার আধিক্য ছিল এবং যোদ্ধারা নেক ও খোদাভীরু ছিলেন, দোয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। সেজন্য আপনি যদি ঐ সকল যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে মনে হবে যেন অগণিত চড়ুই বাজ পাখীর উপর আক্রমণ করেছে এবং তাদের পরাস্ত করেছে। এই আলোকে বলছি যে, আজকেও ইহাই হবে। কিন্তু দোয়ার মাধ্যমে হবে। তা ছাড়া আর কোন মন্ত্র নেই। সে জন্য ভাষাবিদ না থাকলেও দোয়া বিশারদ তো রয়েছেন। প্রত্যেক আহ্‌মদীর দোয়ার সাথে এমন একটি নৈসর্গিক শক্তি ক্রিয়াশীল আছে তা পৃথিবীর অন্যান্যরা বা অন্য জমাত বা বিধর্মীরা ধারণাই করতে পারে না। পৃথিবীর ধর্মীয় জামাতসমূহের যদি জরিপ করেন, তাহলে দেখবেন যে, তারা সম্মিলিতভাবে সারা বৎসরে তত দোয়া করেন না, যত দোয়া আহমদীরা এক সপ্তাহে বা এক মাসে করে থাকে। অথচ সংখ্যার দিক থেকে আহ্‌মদীরা অতি নগণ্য। দোয়ার বিষয়টি জামাতের ভিতর অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যখন একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, দোয়া চায়। একে অন্যকে পত্র লিখতে গিয়ে দোয়ার কথা লিখে। সারা পৃথিবীর এক দিনের সকল পত্র যদি একত্রে দেখার সুযোগ হয়, তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, সেগুলোতে দোয়ার এত চর্চা দেখবেন না, যতটা সীমিত আহ্‌মদীদের একদিনের পত্রে দেখবেন। আমি কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই বলতে পারি যে., সমগ্র পৃথিবীর কয়েক সপ্তাহের পত্রে দোয়ার উল্লেখ অতটা পাবেন না, যতটা আহমদীদের একদিনের পত্রে পাওয়া যায়। প্রতিদিন একমাত্র ইংল্যাণ্ড হতে প্রাপ্ত পত্রে দোয়ার কথা যতটা উল্লেখ থাকে, সারা ইউরোপের একদিনের পত্রে দোয়ার ততটা উল্লেখ থাকে না।

সুতরাং হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে এমনভাবে দোয়াতে অভ্যস্ত করে তুলেছেন যে, দোয়া আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করেছে আর ইহা মাতৃ দুগ্ধের মত আমাদের শিরা উপশিরাতে প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং আপনাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ইহাই। জ্ঞানী না হলেও দোয়াতে তো অভ্যস্ত। ইহাই সেই চূড়ান্ত শক্তি যা পৃথিবীতে বিপ্লব সাধন করেছে। এই বিষয়ের উপর আরও কিছু বলার ছিল কিন্তু যেহেতু সময় শেষ, তাই পরবর্তীতে কোন সময় বলবো।

এই সাধারণ ঘোষণার পর আমাদেরকে U. S. S. R অর্থাৎ Union of Soviet Socialist Republic (সাবেক) এর বিভিন্ন এলাকায় অর্থাৎ খৃষ্টান অধ্যুষিত এলাকায়, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়, এশিয়ান এলাকায়, তা মুসলমান অধ্যুষিত হোক বা বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যুষিত এলাকা হোক এক কথায় সর্বত্র আমাদের অগণিত ওয়াকফে যিন্দেগীর প্রয়োজন, যারা অস্থায়ীভাবে নিজেদেরকে পেশ করবেন। খরচাদির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, সচরাচর রাশিয়াতে অল্প খরচেই চলে, যদি হোটেলে অবস্থান না করে। পরিস্থিতি এখন এরূপ মোড় নিয়েছে যে, দরবেশের মত লোকেরা কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই মসজিদে অবস্থান করতে পারে। অধিকন্তু তারা যদি জামাতের সাথে যোগাযোগ করার পর যাত্রা করে, তাহলে আমরা তাদেরকে এমন সাহায্যকারী বন্ধুর (سلطانا نصيرا) সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি, যারা তাদের তত্ত্বাবধান করবে, খেয়াল রাখবে, পরামর্শ দেবে এবং তাদের খরচ বাঁচাবে। سلطانا نصيرا (সাহায্যকারী বন্ধু) প্রসংগে বলছি যে, সফরকারীদের সর্বদা এই দোয়াটি স্মরণ রাখা উচিত যা আমি সারা জীবন কাজে লাগিয়েছি এবং অচিন্ত্যনীয়ভাবে উপকৃত হয়েছি। প্রত্যেক আহমদীকে সকল সফরের পূর্বে এই দোয়া পাঠ করা উচিৎ :

ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا

অর্থাৎ (হে আমার প্রভু! আমাকে এই দেশে সীদক অর্থাৎ সত্যবাদিতার সাথে প্রবেশ করাও مدخل صدق এবং এই দেশ হতে বা এই স্থান হতে সত্যবাদিতা এবং সীদকের সাথে বের হওয়ার তৌফীক দাও। واخرجنى مخرج صدق এবং শুধু তোমার পক্ষ হতে (অন্য কারো পক্ষ হতে নয়) আমাকে এমন সাহায্যকারী দাও যে سلطان অর্থাৎ যার প্রাধান্য বিস্তার করার শক্তি থাকে সে দুর্বল না হয় এবং দুর্বলকে যেন সে সবল করে তুলতে পারে। (বনী ইসরাঈল : ৮১ আয়াত)

সুতরাং শুধু খোদার খাতিরে যারা এই দোয়ার দ্বারা সফরের সূচনা করবে, সকল দুর্বলতার বিরুদ্ধে এই দোয়া এবং পরের সকল দোয়া অবশ্যই কার্যকরী হবে ইনশাআল্লাহ্। আর U.S.S.R এ যেই বিপ্লব দেখতে চাই, তা শুধু আমাদের বাসনা পর্যন্তই সীমিত থাকবে না বরং প্রকৃত বিপ্লবের রূপ নেবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের তৌফীক দান করুন।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের নব বর্ষের (১৯৯২) ঘোষণা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ২৭শে ডিসেম্বর, '৯২ তারিখে জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নতুন বৎসরের ঘোষণা করেন। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ ২৭শে ডিসেম্বর '৯২ কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত ১০০তম বার্ষিক জলসার দ্বিতীয় দিনও ছিল। দীর্ঘ ৪৫ বৎসরের বিরতির পর কাদিয়ানে খলীফাতুল মসীহের উপস্থিতি আহমদীয়াতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র একাধিক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর উক্ত খুৎবা এর অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হলো। মূল খুৎবাটি উর্দু ভাষায় ছিল আর এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেক জামা'তের নিকট অনুরোধ তারা যেন হুযূরের (আইঃ) বাণীর মর্ম উপলব্ধি করার জন্য মূল খুৎবার ক্যাসেট অবশ্যই শ্রবণ করেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন, আজ হইতে ৩৪ বৎসর পূর্বে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সনের দিনটিও শুক্রবারই ছিল যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল্‌ মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) প্রথম ওয়াক্‌ফে জাদীদের গোড়াপত্তন করেন। আজও শুক্রবার এবং ২৭শে ডিসেম্বর যখন মহান আল্লাহ্‌ আমাকে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বৎসরের ঘোষণা কাদিয়ান হতে করার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। এই বৎসরের অন্যান্য ঐশী যোগাযোগের ন্যায় ইহাও একটি এবং নিঃসন্দেহে ইহা মহান আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর সর্ব প্রথম আহ্‌বানে ওয়াকফে জাদীদের জন্য সামান্য পরিমাণ চাঁদা চেয়ে ছিলেন। তিনি সরল ও সহজভাবে মাত্র কয়েক হাজার টাকার তহবিল গঠনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সাড়া পাওয়া গিয়েছিল অভূতপূর্ব এবং আশাতীত চাঁদাও সংগ্রহ হয়েছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) উল্লেখ করেন যে, পরে এক সময়ে তাঁর এক মা বলেন যে, একটি ব্যাপার তার কাছে আশ্চর্য ঠেকে ছিল। হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) তাঁর সেই স্ত্রীর নিকট একান্তভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রথম ঘোষণার পর পরই তিনি মজলিসে ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রথম সদস্য হিসাবে তাহের (বর্তমান খলীফা রাবে') এর নামটা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

হুযূর (আই) বলেন, এটাও হয়তো মহান আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা ছিল যে, সেই ব্যক্তি যার নাম হযরত মুসলেহ মাওউদ ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রথম সদস্য হিসাবে নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করে ছিলেন আমি সেই ব্যক্তি আজ ৩৪ বৎসর পর খলীফাতুল মসীহ হিসাবে দেশ বিভাগের ৪৫ বৎসর পর কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক বার্ষিক জলসার মধ্যে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নতুন বৎসরের ঘোষণার মহান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুযোগ পাচ্ছি।

হুযূর (আইঃ) আরও বলেন যে, প্রথম থেকেই ওয়াক্‌ফে জাদীদের আন্দোলন ভারতে দুর্বল রয়েছে। যদিও এই আন্দোলনটিকে ভারতের মত দেশেই অসাধারণ গুরুত্ব প্রদান করা উচিৎ ছিল, তবুও মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভারতীয় জামাতসমূহ এই আন্দোলনটিকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ ভারতে সব সময়েই এই আন্দোলনের তহবিল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকারের হয়ে আসছে।

ওয়াকফে জাদীদের মধ্যে এমন একটি আন্দোলনের সম্ভাবনা নিহিত আছে যদ্বারা স্বল্প ব্যয়ে সারা ভারতে আহ্‌মদীয়াতের বাণী পৌঁছানো সম্ভব। হযরত আব্দাস (আইঃ) বলেন যে, ভারতের প্রয়োজন এতই ব্যাপক যে, এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পরে তিনি কাদিয়ানের জামা'ত ও কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন যেন তাঁরা ভারত সরকারের নিকট আবেদন করে অনুমতি হাসিল করেন যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য দেশ থেকে আহমদী প্রচারক এসে ভারতে কাজ করতে পারেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন, ভারত সরকার যদি এই ধরণের অনুমতি দিতে সম্মত হন তবে তিনি বিশ্বব্যাপী ওয়াক্‌ফে জাদীদের এমন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন যাতে ভারতের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। এছাড়া আরও অনেক দেশ আছে যেখানে ওয়াক্‌ফে জাদীদের অনেক কিছু করণীয় আছে।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ও সফলভাবে পরিচালনার জন্য এবং অত্যন্ত বৃহৎ চাহিদা পূরণের নিমিত্তে হুযূর (আইঃ) কাদিয়ানে একটি বৃহদাকার জামেয়া প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যেখানে মৌলভী ফাযিলদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ওয়াক্‌ফে জাদীদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে।

এরপর হুযূর (আইঃ) ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে এমন দশটি জামা'তের নাম পড়ে শুনান যারা ১৯৯১ইং সালে ওয়াক্‌ফে জাদীদের তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, তিনি এই নাম ঘোষণার মাধ্যমে চান যারা ভাল কাজ করেছেন তারা যেন সান্ত্বনা লাভ করেন এবং যারা পিছনে পড়ে গিয়েছেন তারা যেন নিজেদের কাজের মূল্যায়ন দ্বারা ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অধিক হারে চেষ্টিত হন।

প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল এই যে, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বাইরের দেশসমূহ প্রথম দিকে মাত্র কয়েক হাজার পাউণ্ড প্রদান করে। কিন্তু আজ যখন ১৯৯১ সাল শেষ হয়ে আসছে সেই সব জামা'তের প্রদত্ত চাঁদার যোগফল ১০৫,৯৬৩ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। যদি এই অংকটিকে রূপীতে প্রকাশ করা হয় এবং ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের চাঁদাও এর সাথে যোগ করা হয় তবে মোট ওয়াক্‌ফে জাদীদ তহবিল এক কোটি রূপীতে দাঁড়াবে। এটি হল মাত্র এক বছরের সংগৃহীত চাঁদা। ইহা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্‌র বিরাট দান। ইহা এই বৎসরে সংঘটিত আরও একটি ঐশী ঘটনা।

জার্মানী ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা দানে গত বছরের মত এই বছরেও অন্য সব দেশের চাইতে সর্বাগ্রে আছে। দ্বিতীয় স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় ক্যানাডা, চতুর্থ যুক্ত রাজ্য, পঞ্চম ইন্দোনেশিয়া, ষষ্ঠ জাপান, সপ্তম নরওয়ে, অষ্টম মরিশাস, নবম হল্যাণ্ড ও দশম বাংলাদেশ।

জাপান সব ধরণের চাঁদায়ে জনপ্রতি অনন্য স্থান অধিকার করেছে এবং সে অবস্থানও এতই উর্ধ্বে যে, মনে হয় না অন্য কোন দেশ নিকট ভবিষ্যতে তাদের নাগাল পাবে।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের গুরুত্ব এবং এর বিরাট ভূমিকার উল্লেখের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ (আইঃ) সাধারণভাবে সব জামা'তকে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় জামা'তসমূহকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করার জন্য নতুন উদ্যম এবং বড় মন নিয়ে এগুবার আহ্‌বান জানান। হুযুর (আইঃ) বলেন: "যদি তাঁরা (জামা'তসমূহ) ত্যাগ স্বীকার করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র আশিস পাবেন এবং তিনি তাঁদেরকে পার্থিব সম্পদও প্রদান করবেন।" ওয়াক্‌ফে জাদীদের সেবার ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করার প্রসংগে হুযুর (আইঃ বলেন:

আমি দোয়া করি মহান আল্লাহ্‌ যেন আপনাদেরকে সাহস ও শক্তি প্রদান করেন। নিজের দেশের প্রয়োজন অনুপাতে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য। আর আমি আশা করি, এই ক্ষেত্রে আপনাদের সাড়া তেমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে যেমন এই জলসাটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে।

এই বৎসর ওয়াক্‌ফে জাদীদের তাহরীক একটি অসাধারণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা ধারণ করেছে। হুযুর আক্‌দাস (আইঃ) কতিপয় নতুন এবং বৃহদাকার কার্যক্রমের দিকে ইংগিত করেন যার জন্য ওয়াক্‌ফে জাদীদের তহবিল ব্যবহৃত হবে। আমি এ জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, এই আন্দোলনের প্রতি বিশেষ নজর দিবেন এবং নিশ্চিত করবেন যেন আপনার জামা'তের প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা ও শিশু এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

আনসার, খুদ্দাম এবং লাজনা প্রত্যেক অংগ সংগঠনের সাহায্যে ওয়াদা সংগ্রহ করা যেতে পারে। অনুগ্রহপূর্বক যত শীঘ্র সম্ভব ওয়াদার তালিকা অত্র দপ্তরে প্রেরণ করবেন। মহান আল্লাহ্‌ আপনাদের প্রয়াশকে সফল করুন।

পরিশেষে স্মরণ রাখতে হবে যে, সমস্ত সফলতা ও আশিস মহান আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্য। তাই আমাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে যেন তিনি আমাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করেন যার ফলে আমরা তাঁর আশিস লাভ করতে সক্ষম হই।

এস, এম, আশরাফ, অতিরিক্ত উকিলুল্‌ মাল কর্তৃক প্রেরিত ইংরেজী সংক্ষিপ্ত চিঠির বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী, সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ, আঃ মুঃ জামাত, বাংলাদেশ। তিনি বাংলাদেশের সকল জামা'তকে যত শীঘ্র হুযুর (আঃ)-এর উপরোক্ত হেদায়াতের ওপর আমল করে ১৯৯২ সনের ওয়াদার তালিকা তাঁর নিকট পাঠাতে বলেছেন যেন ওগুলো একত্র করে যথারীতি হুযুর (আঃ)-এর খেদমতে সত্বর পেশ করা যায়।

ব্যবধান ও অবদান

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

(১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

মননশীলতার ক্ষেত্রে প্রাণী জগতে মানুষ অনন্য। এর পরিধি এত ব্যাপক ও বৈচিত্রময় যে, এর সীমা নিরূপণ করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। বুদ্ধি-বিবেচনা [বিবেক], চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, নিয়ম-শৃংখলা, কৃষি, কলা-কৃষ্টি, রান্না-বান্না, পোষাক-আশাক, শিল্প-সাহিত্য, সমাজ কাঠামো, রাজনীতি-অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-সমিতি, সংস্থা-সংগঠন অর্থাৎ মানুষের সমগ্র সৃজনী শক্তি, দায়-দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আদর্শ ও সচেতনতা সব কিছুই মননশীলতার আওতাভুক্ত। মননশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষকে তার সাধ্যমত সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ অনুযায়ী অবদান রাখতে হবে। তা না হলে তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার না করার কারণে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সে মনুষ্যত্বহীন হয়ে অন্যান্য প্রাণীর স্তরে চলে যাবে। অর্থাৎ মানুষ পরিপূর্ণ ব্যর্থতার জীবন বহন করবে যা কখনও কারো কাম্য হতে পারে না। স্রষ্টাও তাতে সন্তুষ্ট হন না। তাতে ইহকালে থেকেই, ইহকাল পরকাল দু'টোকে নিজ হাতে নষ্ট করে দেয়া হয়। মানুষে মানুষে দৈহিক পার্থক্যের সীমা রেখা টানা দুষ্কর। এখানে শুধু একটি বিষয়ের উপরই জোর দিতে চাই আর তা হলো এসবের জন্য ব্যক্তি বা জাতিগতভাবে কেউ দায়ী নয়। কেননা চেহারা সুরত, রং এসব আল্লাহ্‌র দান। এসবের জন্য কোন ব্যক্তি বা জাতিকে হেয় চোখে দেখা আল্লাহ্‌কে দায়ী করা ও অবমাননা করার শামিল। এসবের কারণে অহংকারেরও কিছু নেই। বরং স্রষ্টার শুকরিয়া আদায়ের অনেক কিছু আছে। অথচ দুনিয়াতে এসবকে কেন্দ্র করে অযথা নানা মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। অযথা অশান্তির বেদনাদায়ক কারণ জিইয়ে রাখা হচ্ছে। এসব সমস্যা দূরীকরণে বিবেকবান লোকদের জন্য বাস্তব অবদানের বিশাল অংগণ পড়ে আছে। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কালোদের প্রতি সাদাদের অমানবিক ব্যবহারে এদেশের যারা তীব্র ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করে, কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বাহবা কুড়ায় তারাও কালো মেয়ের বিবাহের প্রস্তাবে লাফিয়ে দূরে সরে যায়। ভেবে দেখে না, একই সময়ে তারা কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ হতেও দূরে পালাচ্ছেন। কিন্তু তারা কি আল্লাহ্‌র দৃষ্টি এড়াতে পারছেন? যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বসহ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে তা হলো আকার, আকৃতি, রং এসবের জন্য স্রষ্টার সমক্ষে জবাবদিহি করতে হবে না। অপরদিকে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি, দায়-দায়িত্ব, বিশ্বাস, আদর্শ, নীতি, আচার-আচরণের জন্য নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে।

মেধার মাঝেও মানুষে মানুষে পার্থক্য বিপুল; এর ক্ষেত্র যে অগণন, তা আগেই বলা হয়েছে। যে যত মেধার অধিকারী তার অবদান রাখার দায়িত্ব তত বেশী এবং সে অবদান ক্ষেত্র ও সুযোগ অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার সমাজ, জাতি, বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং শুধু আদম সন্তানদের জন্যই নয় সারা সৃষ্টির জন্যই কল্যাণকর হতে হবে।

অসাধারণ বা বিরল প্রতিভার লোক খুব স্বল্পই থাকেন। কিন্তু মানুষের উত্থান পতনে তাঁদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ 'সংখ্যালঘুদেরকে' ইংরাজীতে 'সল্ট অব দি আর্থ'' অর্থাৎ পৃথিবীর জন্য লবণ স্বরূপ বলা হয়। তাৎপর্য হল এরা দুনিয়ার অগ্রগতি ও ভারসাম্য রক্ষার সূক্ষ্ম স্থানে অবস্থান করেন। এজন্য তাঁরা অতীব ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। লবণের প্রয়োজনীয় ব্যবহার খাদ্যকে স্বাদু করে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার খাদ্যকে বিস্বাদে, এমনকি অখাদ্যে কুখাদ্যে পরিণত করে। এঁদেরকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। এঁরা সমাজের মাথা স্বরূপ। মাথা ভাল থাকলে অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগও ভাল কাজ করে। মাথা খারাপ হলে অংগ-প্রত্যংগও ঠিকমত কাজ করে না, বরং ভুল কাজ করে বা কু কাজ করে। মাথা-খারাপ লোক শুধু নিজের জন্যই নয় অপরের জন্যও বহু অনর্থ সৃষ্টি করে। মাও সে তুং বলেছেন, মাছের পতন যেমন মাথা থেকে শুরু হয়, কোন সমাজ বা জাতির পতনও 'মাথা' অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে শুরু হয়।

এখানে একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক সর্বাধিক গুরুত্বসহ উল্লেখের দাবী রাখেন। তাঁরা হলেন স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত নবী রসুলগণ। এঁদের শিক্ষা ও আদর্শের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে অবক্ষয় মুক্ত করা ও রাখা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত উপায়ে তাদেরকে পবিত্রতায় ভূষিত করে, পবিত্র সমাজ গড়া। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যরাও একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যান। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, তাঁদের এমন সময়েই আগমন হয় যখন মানবতা অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী আক্রমণে হাবুডুবু খায় এবং দিশেহারা, পথ-হারা হয়ে তলিয়ে যেতে থাকে। তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত 'সীরাতুল মুস্তাকীম' নিয়ে হাযির হন। তাঁদের আগমন দুনিয়ার জন্য বড়ই শুভাগমন তাঁরা ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীরা নতুন সমাজের নতুন জাতি গড়ে তোলার। প্রাণপণ ও নিরলস প্রয়াস চালান। এই আপ্রাণ চেষ্টাকেই কুরআনের ভাষায় 'জেহাদ' বলা হয়। তাঁদের অবদান বলে শেষ করা যায় না। তাঁদের মহান অবদানের জন্য সদা তাঁরা বিনয়াবনত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করে যান। অপরদিকে যারা তাঁদের প্রবাহিত আল্লাহ্‌র এই কল্যাণ-স্রোতকে রোধ করতে আদাজল খেয়ে লাগে, তারা নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের অপচেষ্টাকে তাদের মহৎ ধর্মীয় অবদান হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্ট চালায়। সংখ্যাধিক্যের বলে, তারা সত্যকে, কল্যাণকে পিষে মারার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারা ইতিহাস পড়েও তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তারা দুনিয়ায় অমংগলের বাহক রূপেই চিহ্নিত হয়। তারাও তাদের সব অপকীর্তি পরবর্তীদের দ্বারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের জারি-জুরি ও পাণ্ডিত্য জাহেলিয়ৎ ও মূর্খতা

সাব্যস্ত হয়। কেননা, তারা সাময়িক বশের কাঙ্গাল থাকে। অন্যান্য সৃষ্টি হতে মানুষের তৃতীয় বড় বৈশিষ্ট্য হলো সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা। এই বৈশিষ্ট্য মানুষকে স্থবীরতা হতে রক্ষা করে ও গতিশীলতা দান করে। একই সময়ে বিবেক, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধকে সক্রিয় রাখার সুযোগ করে দেয়। মানুষের গতিশীলতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে, তার স্বাধীনতার প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। অন্যান্য অনেক প্রাণীর মত মানুষেরও 'প্রয়োজন' ও 'প্রবণতা' অনেক আছে। কিন্তু এসবের পরিধি ও বিকাশে এবং এগুলোর সুষ্ঠু ভাবে ও সামাজিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে মানুষের মাঝে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা অতুলনীয়। 'প্রয়োজন' দ্বারা এখানে বাঁচার জন্য যা অত্যাবশ্যকীয় তা এবং 'প্রবণতা' দ্বারা এমন সব বিষয় বুঝতে হবে যা স্বভাবে আছে কিন্তু (ব্যক্তি) জীবনধারণের জন্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। দু-একটি উদাহরণ নিলেই বিষয়টি সহজ হবে বলে আশা করা যায়। খাদ্য জীবন মাত্রেরই বাঁচার জন্য একান্ত প্রয়োজন [Essential need]। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন, প্রস্তুতি ও গ্রহণের ব্যাপারে মানুষ অনেক কিছু উদ্ভাবন করে চলেছে, বা অন্যান্য প্রাণীর মাঝে মোটেও দেখা যায় না, কোন দিন দেখা যাবে বলেও মনে হয় না। মানুষের আবিস্কৃত কৃষি, রান্না-বান্না আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়া দাওয়া এবং এ ব্যাপারে হারাম হালালের কথা বিবেচনা করলে বিষয়টি অনেকটা স্পষ্ট হবে। এখন প্রবণতার বিষয়ে আসা যাক। যৌন প্রবণতা অনেক প্রাণীতে স্পষ্ট নয়। অনেক প্রাণীতে মানুষের মতই সুস্পষ্ট কিন্তু বিকাশে বিরাট ব্যবধান দেখা যায়। তাই অন্যান্য প্রাণীর বেলায় এ ধরণের প্রবণতাকে 'প্রবৃত্তি' [Instinct] এবং মানুষের বেলায় ওসবকে 'শক্তি' [Capacity] বলা যায়। যে অর্থে এখানে 'প্রবৃত্তি' ও 'শক্তি' শব্দ দু'টো ব্যবহার করা হয়েছে, উদাহরণের মাধ্যমে তার তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা করা যাক। প্রবৃত্তির বিকাশে তেমন কোন বৈচিত্র থাকে না। চেষ্টা-চরিত্র দ্বারাও বিশেষ কোন পরিবর্তন আনা যায় না। সামান্য পরিবর্তন আনা হলেও তা স্থায়ী হয় না। বিশেষ প্রশিক্ষণ দ্বারা মানুষ যদিও কিছু কিছু জীবকে অনেক নতুন কিছু শিখাতে পারে। কিন্তু ওরা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তা দিয়ে যেতে অর্থাৎ সংক্রামিত করতে পারে না। যৌন প্রবণতাকে সুষ্ঠুভাবে বিকাশ ও গঠনমূলক কাজে লাগানোর জন্য মানুষ বিবাহের প্রচলন করে। এর মাধ্যমে এক জোড়া নর নারীর মাঝেই শুধু সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। দুটো পরিবার, গোষ্ঠি, গ্রাম এমন কি দুই দেশের মাঝেও আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপরদিকে এর দ্বারা একটি পরিবার গড়ার দৃঢ় ভিতও স্থাপিত হয়। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন গড়ায় পরিবারের অবদান অপরিসীম। জন্ম থেকে মানব শিশুকে নাগরিক, ধার্মিক, সামাজিক করে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের ন্যায় এমন কোন স্বাভাবিক সংস্থা [Institution] আর নেই। পারিবারিক জীবনের অবদান নিয়ে আলোচনা না বাড়ায়ে একটি বিষয়ে উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন মনে করছি। যারা যৌন স্বাধীনতার

নামে বিবাহ বন্ধনকে উচ্ছেদ করতে চায়, তাদের উচিত এর চেয়ে ভাল কিছুর সন্ধান দেয়া। নতুবা সমাজকে কেবল ভাংগার পথই দেখানো হবে—গড়ার নয়। শুধু ভাংগা নয়, ভাংগা-গড়া উভয় দিয়ে সমাজ গড়া সম্ভব হয়, বিভিন্ন ধর্ম, দেশ, জাতি উপজাতিতে বিবাহ বন্ধনের বৈচিত্রের কথা চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যায়, যৌন প্রবণতাতেও মানুষ কত বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। শ্বশুর বাড়ীর জামাই আদর শালা শালীদের কৌতুকাদির কথা ভাবলে দেখা যাবে বিবাহের অভাবে অন্যান্য প্রাণী কত বঞ্চিত হচ্ছে। এবং যারা বিবাহহীন যৌন সম্পর্কের ওকালতি করছে তারাও সমাজকে ও নিজেকে এসব হতে বঞ্চিত রাখতে চায়। এ বঞ্চনাকে আর যাই হউক অবদান বলা যাবে না। পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে এড়িয়ে যারা কৌতুকরূপ পংকিলতার আমদানী করেছে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা বরং সমাজের জন্য হবে বড় অবদান। সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার কি ভয়ানক অপবিত্র বন্দী ফিকির!

মানুষ যে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায়, 'যখন এ মন চাহে যা' করার মত স্বাধীনতা পেতে পারে না। সে বিষয় তলিয়ে দেখা যাক। যেদিন থেকে মানুষ তার জীবনে যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে সেদিনই সে নিজ হাতে অবাধ স্বাধীনতার লাগাম লাগিয়েছে। কখনও এ লাগাম মুক্ত হওয়া যাবে বলে মনে হয় না। যেদিন মানুষ বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, আইন-কানুনকে জীবনে স্থান দিলো, সেদিনই সে শান্তি শৃংখলার দিকে পা বাড়ালো। জীবনে সংযমের গুরুত্বও অনুভব করলো। তাতে অবাধ স্বাধীনতা তথা উচ্ছৃংখলতা অনেক খানি নিয়ন্ত্রিত হলো। যেদিন হতে মানুষ আদর্শকে বরণ করলো সেদিন হতে উন্নত জীবনের সন্ধান পেলো, জীবনের অপচয় অপব্যয় রোধের পথ তার কাছে ধরা দিলো। সেদিন থেকে ক্রমাগত উপলব্ধি করতে থাকলো যে, সমগ্র সৃষ্টিই নিয়ম ও শৃংখলায় বাঁধা। তাতেই সৃষ্টিতে স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈচিত্রের মাঝেও ঐক্য ও ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে। সৃষ্টির অংগ হিসেবে মানুষও নিয়ম শৃংখলার বাইরে যেতে পারে না। তাই বলা যায় যুক্তি, নিয়ম-নীতি, আদর্শ, গবেষণা এ সব মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয় নি বরং তার জীবনকে উন্নত ও সার্থক করে তুলেছে, উর্দ্ধগতির পথ বাতলিয়েছে। তবে, এসবের বিপরীত দিকের বিষয় নিয়েও আলোচনা করা দরকার। তা না হলে অধঃগতি সম্বন্ধে সাবধান ও সতর্ক থাকা যাবে না।

মানব জীবনে গতিশীলতার প্রধান তিনটি স্তর হলো স্থবিরতা, অধঃগতি ও উর্দ্ধগতি। ব্যক্তি বা জাতি যখন যে অবস্থায় আছে তাতে যখন আবদ্ধ থাকে ও উৎসাহ উদ্যমহীন হয়ে পড়ে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ শক্তি সামর্থ্যের ও বাহ্যিক শক্তিসমূহের [প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ] বড় একটা সন্ধান রাখে না, তখনই স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়। উদাহরণ হলো, অনেক পাহাড়িয়া জাতি বিংশ শতাব্দীতেও স্থবিরতায় ভুগছে। স্থবিরতা যেমন মনশীলতায় জড়তা সৃষ্টি করে, তেমতি মননশীলতার জড়তা ও স্থবিরতাকে ত্বরান্বিত ও দৃঢ়মূল করে। এভাবে এক হীন চক্রের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি স্থবিরতা ইন্ধন জোগায়।

ব্যক্তি বা জাতি যখন তাদের শক্তি সামর্থ্য ও বাহ্যিক শক্তিসমূহের অপব্যবহার করতে থাকে তখনই অধঃগতি শুরু হয়। অধঃগতি নানা দুর্গতির কারণ হয়ে থাকে। অধঃগতিতে গতি থাকে সত্য তবে তা রুগ্ন মননশীলতায় আক্রান্ত বলে ক্রমাগত মানুষকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর অকল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। অর্থাৎ অধঃগতিতে মানুষ পৈশাচিক ও অমানবিক ভোগ বিলাসে মেতে উঠে। অপরদিকে মানুষ যখন তার আগ্রহ আবেগ উৎসাহ উদ্দীপনা দ্বারা অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের সুষ্ঠু ও ক্রমবিকাশ ঘটায় এবং বহিঃশক্তিসমূহকে গঠনমূলক ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে থাকে, তখনই উর্দ্ধগতি শুরু হয় এবং ক্রমাগত জোরদার হতে থাকে। তখন সভ্যতার দিগন্ত সম্প্রসারিত হয় ও সমাজ তখন ফুলে ফসলে ভরে ওঠে এবং সুশোভিত হয়। ছোট কিছু উদাহরণ নিলেই উর্দ্ধ ও অধঃগতি সম্বন্ধে ধারণা আরো সুস্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তির বলে নানা ধরণের যন্ত্র আবিস্কার দ্বারা জীবনের অনেক যন্ত্রণা হ্রাস করছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াচ্ছে। এ সব উর্দ্ধগতির চিহ্ন বহন করে। অপর দিকে ষড়যন্ত্র দ্বারা মানুষ বহুগুণে যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য হারাচ্ছে। অন্যান্য প্রাণীর জীবনে যন্ত্র, ষড়যন্ত্র কোনটারই অস্তিত্বঃ নেই। তাদের জীবনে অধঃগতি উর্দ্ধগতিও নেই।

সংক্ষেপে উল্লেখিত গতিসমূহের উৎসে যাওয়া যাক। মানুষের মাঝে জীবত্বের সাথে হীনত্ব এবং মহত্বের বীজও রোপিত রয়েছে। যখন হীনত্ব বা মহত্ব কোন দিকেই সে পা বাড়াতে চায় না তখন সে শুধু জীবত্ব নিয়েই যেন বাঁচতে থাকে। তখন মানুষ হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবধানটা অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। সে যেন অন্যান্য জীবের মতই হয়ে যায়, যদিও দৈহিক পার্থক্য সব থেকে যায়। এ অবিকশিত অবস্থাকে বলা যায় স্থবিরতা। নিজের ইচ্ছায়, শক্তিসমূহের অপব্যবহার যখন মানুষের হীনত্বকে জাগ্রত ও মহত্বকে বিব্রত ও স্তিমিত করতে থাকে, তখন তার অধঃগতি বাড়তে থাকে। এর শেষ নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। কুরআনের ভাষায় মানুষের এ মর্মান্তিক অবস্থাকে 'আসফালা সাফেলীন।' [সূরা ত্বীন – ১০] অর্থাৎ 'হীন হতে হীনতম অবস্থা' বলা হয়েছে। বর্তমান যমানায়, মানুষ যে বিশ্বব্যাপী এ অবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবক্ষয়ই এর অকাট্য সাক্ষ্য বহন করছে। অপরদিকে শক্তি সামর্থ্যের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার দ্বারা মানুষ যখন তার হীনত্বকে প্রতিহত করে মহত্বে ভূষিত হতে থাকে, তখনই তার উর্দ্ধগতি জোরদার হয়। তখন অন্যান্য জীব হতে তার ব্যবধান এবং সভ্যতায় তার অবদান বেড়ে চলে। যাকে বলা যায় ব্যবধানের কল্যাণকর অবদান। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে, মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতার সর্বাধিক তাৎপর্যবহ ব্যাখ্যা দেয়া যায় বলে মনে হয়। আর তা হলো, সে জীবনে স্থবিরতা, অধঃগতি বা উর্দ্ধগতির কোন্‌টি বেছে নিবে, স্রষ্টা কর্তৃক তাকে সে স্বাধীনতাই দেওয়া হয়েছে। এ দেওয়াতেই যদি আল্লাহ ইতি টানতেন, তবে মানুষের জন্য পরকালের হিসেবের প্রশ্ন ওঠতো না, ভাবনাও থাকতো না। আল্লাহ্‌ মানুষকে বিবেক অর্থাৎ মানুষের অভ্যন্তরে ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়

নির্দেশক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা [Automatic Indicaton of good and bad and right and wrong] দিয়েছেন। আলকুরআনে মানবাত্মা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'ফা আলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা' অর্থাৎ মানুষের আত্মায় ভাল-মন্দের জ্ঞান প্রোথিত করে দিয়েছি। পরিবেশের নানা বিরূপ প্রভাবে এই হিতাহিত জ্ঞান বিবেকও আচ্ছন্ন বা বিভ্রান্ত হতে পারে তাই আল্লাহ্‌ এখানেই আমাদের সৎ হওয়ার পথ শেষ করেন নি। তিনি তাঁর অসীম করুণায় মানুষকে তাঁর নির্দিষ্ট সৎপথের সন্ধান দিয়ে নবী রসুল প্রেরণ করছেন। তাঁরা শুধু আল্লাহর বাণী তথা বিধি বিধানই বহন করেন নি, ওসব কিভাবে কার্যকর করতে হবে তাও করে দেখিয়েছেন। তাঁদের পথে চললে পুরস্কার প্রাপ্তির এবং স্রষ্টার সাথে সংযোগ লাভের কথাও বলেছেন। বিপথে চললে শাস্তির বিধান জানিয়েছেন। তাই বিবেকের স্বাধীনতাকে এবং আল্লাহর অপরাপর দানসমূহকে কে কিভাবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করেছে সে হিসেব নিয়ে তাঁকে স্রষ্টার দরবারে শাস্তি বা পুরস্কারের জন্য হাজির হতেই হবে।

উপসংহার টানার আগে আরো কিছু বলতে হচ্ছে। নবীর রসুলগণের মারফত আল্লাহ স্থবিরতা, নিম্নগতি ও উর্দ্ধগতি চিহ্নিত করে মানুষের জন্য চলার পথের যে পাথেয় দিয়েছেন, তা পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মারফত প্রেরিত পবিত্র কোরআন দ্বারা : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করিলাম "[সূরা মায়েদা : ৪ আয়াত] কোরআনের আরো একটি মহান শিক্ষার উল্লেখ করতে হচ্ছে যাতে আল্লাহ্‌ তাঁর প্রেরিত সকল নবীর ওপর সমভাবে ঈমান আনার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন। এর মাঝে মানুষের জন্য অনেক মংগল রয়েছে যদি আমরা এর সঠিক ব্যবহারে তৎপর হই। এ জন্য সব জাতিকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে। মহব্বতের সাথে সবাইকে আল্লাহর দিকে আসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। তা না হলে এ শিক্ষা, এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বিশ্বনবীর মারফত সারা বিশ্বের মানবতার পরিপুষ্টি সাধন, শান্তি ও ঐক্য স্থাপনের এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

বস্তুতঃ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশ্ব-নবীত্ব এবং বিশ্বের সকল নবীর প্রতি ঈমান আনা, ইসলামের এই যে দু'টো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তদ্বারা মানবতার সেবার বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানেও তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীগণকে নিত্য নতুন অবদান রাখা চাই। তবেই তাদের নিজেদের স্থবিরতা দূর হয়ে, বিশ্বময় ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠবে, শান্তির পথ প্রশস্ত হবে। এমন কথা কোরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, শরীয়তের পূর্ণতার কারণে, মানুষের স্থবিরতা ও অধঃগতিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। বরং সূরা ফাতেহা হতে শুরু করে বহু সূরায় মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে অধঃপতন হতে বেঁচে থাকার জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। তা যে অযথা নয় তা মুসলিম জাহানের বর্তমান চরম

অধঃপতনই ঘোষণা করছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় এই অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ

'ধর্মীয় জ্ঞান উঠিয়া যাইবে, জাহেলিয়াত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করিবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্য কাজ কমিয়া যাইবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরিয়া যাইবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাইবে, মারামারি কাটাকাটি বেশী হইবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হইবে, ভূমিকম্প বেশী হইবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া মানুষ গৌরব অনুভব করিবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রচলন হইবে, দলের সর্দার ফাসেক (দুর্নীতি পরায়ণ) হইবে, জাতির নীচ লোক তাহাদের নেতা হইবে, বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হইবে, উট্‌নী বেকার হইবে, উহাতে চড়িয়া মানুষ দূরদেশে যাতায়াত করিবে না।' (বুখারী মুসলিম) এতে সারা বিশ্বের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। মুসলমানদের অধঃপতনের কথাও বহু হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এ সব হতে মাত্র একটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই উহা ফিরে যাবে।"

(বায়হাকী, মিশকাত)

'পবিত্র কুরআনে এবং হাদীসসমূহে মাহ্‌দী (আঃ)-এর যে সকল কার্যের উল্লেখ আছে উহার সারাংশ হল ঃ

(ক) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এসে ইসলামকে পুনরায় শক্তিশালী এবং মুসলমান-গণকে নিরাপদ করিবেন এবং তাঁহার দ্বারা খিলাফত আলা মিন হাযিন নবুওয়াত অর্থাৎ নবু-ওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয় সূচিত হইবে।

(খ) প্রচলিত ইসলামের সংস্কার সাধন করিয়া তিনি হযরত রসূল করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত মৌলিক ইসলাম তথা প্রকৃত ইসলামকে দুনিয়ার সামনে পেশ করিবেন। তিনি অকাট্য প্রমাণ এবং ঐশী নিদর্শনসমূহের দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবেন, কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বল প্রয়োগের দ্বারা নহে।

(গ) তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে উত্থিত ঈমানকে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন এবং মহৎ চরিত্র ও ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা নাস্তিকতার মরিচা ধৌত করিয়া অন্তরে তৌহীদ ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিবেন এবং ঈমানকে সঞ্জীবিত করিয়া সাহাবাগণের ন্যায় পবিত্র ও প্রকৃত মুমিনেনদের জামা'ত গঠন করিবেন।

(ঘ) তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন অর্থাৎ খৃষ্টীয় মতবাদ খণ্ডন করিবেন।

(মহাসুসংবাদ : সপ্তদশ সংস্করণ : ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা।)

সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, হুযুর (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। হুযুর (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মারফত ইসলাম আবার পুনর্বাসিত ও বিশ্ব বিজয়ী হবে সে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। আহ্‌-মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মহাসুসংবাদ নামক পুস্তিকায় এসব বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সারা বিশ্বে প্রকৃত ইসলাম প্রচারের জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। নবীদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা ও অন্যান্য চালু সমাজ ব্যবস্থা হতে নানা দিক হতে ভিন্ন ও উন্নত হয়ে থাকে। এই ব্যবধানই দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিষ্ঠায় ও মানুষের কল্যাণকর উর্দ্ধগতিতে বেশুমার অবদান রেখে যায়। অতএব, অহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-দৌলত এবং আল্লাহ্‌-প্রদত্ত মেধা ও অন্যান্য গুণাবলী, যার যা আছে, তা দিয়ে অন্ততঃ সে অনুপাতে অবদান রাখতে হবে। স্মরণীয় যে, বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হয় তো শিষ্ট হওয়া যায়, বিশিষ্ট হওয়া যায় না। আল্লাহর এ সব নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার দ্বারাই আল্লাহর ইচ্ছা আমাদের জীবনে কার্যকর হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়। আল্লাহ! তুমি আমাদের সবাইকে সে তৌফীক দান করো। (আমীন)

লণ্ডনডেরী [গ্রেট বৃটেন]
১৭ ১৯/৯/১৯৯০

(২য় পাতার পর।

তথ্যপঞ্জী : ১। নয়াচীনের সংক্ষিপ্ত—পরিচয় বেইজিং (চীন) থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত।

২। বেইজিং (চীন) থেকে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'চীনের ইসলাম ধর্মাবলম্বী দশটি সংখ্যালঘু জাতি' লেখক চুনিং।

৩। বেইজিং (চীন) থেকে ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত 'আফিম যুদ্ধ থেকে মুক্তি' ইজরায়েল এপষ্টাইন প্রণীত।

৪। বেইজিং (চীন) থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত Windows on china.

৫। পাক্ষিক আহ্‌মদী, Asia week ও News week এর কিছু সংখ্যা

চীনে আহমদীয়াত

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

(১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

১৯৩৪ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ২য় খলীফার (রাঃ) তাহরীকে জাদীদ ঘোষণার পর পরই এ কর্মসূচীর অধীনে চীনে ইসলাম প্রচারের প্রয়াস চালানো হয়। পাঞ্জাবের খুশাব শহরের আদালত খান সাহেব চীনের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান যান। সেখানে গুপ্তচর সন্দেহে তাঁকে বন্দী করে জেলে ঢোকান হয়। তিনি জেলেই সত্যের প্রচার চালাতে থাকেন। তখন আফগান সরকার তাঁকে জেল থেকে বের করে দেন এবং তিনি কাদিয়ানে চলে এসে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর কাছে আবারো চীনে যাবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। এবারে তিনি মুহাম্মদ রফীক সাহেবসহ চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যাবার পথে কাশ্মীরে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যু যখন সন্নিকট তখন তিনি ঘোষণা দেন যে, আমি এ অবস্থাতেও বেঁচে যেতে পারি যদি কেউ আমার সাথে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে মুবাহালা করতে চায়। কেউ না আসলে তিনি ইন্তেকাল করেন। দেখুন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার প্রতি তাঁর কি দৃঢ় আস্থা ছিল! ইনি ছিলেন তাহরীকে জাদীদ কর্মসূচীতে অংশ নিতে গিয়ে দ্বিতীয় শহীদ। প্রথম শহীদ ছিলেন জনাব ওলীদাদ খান সাহেব। তাঁর প্রচারে আফগানিস্তানে বহু সত্যপিপাসু মানুষ সত্যকে গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি একবার আফগানিস্তানে ফেরত যাবার সময় তাঁকে গুলী করে হত্যা করা হয়। জনাব আদালত খানের ইন্তেকালের পর তার সাথী মুহাম্মদ রফীক সাহেব কাশ্মীর থেকে কাশগড় গমন করেন। সেখানে হাজী যুনুদুল্লাহ সাহেবসহ অনেক সত্যান্বেষী মানুষ বয়াত গ্রহণ করেন। এঁরা সবাই পরে প্রচার কার্যে অংশ নিয়ে আরও বহু মানুষকে সত্যের সন্ধান দেন।

এর পরে ১৯৪৯ সালে চীনে এল কমিউনিষ্ট শাসন। ধর্মের ব্যাপারে এই শাসন ছিল চরমভাবে নির্দয়। চীন প্রসঙ্গে লেনিনের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যদিও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেদেশে মসজিদ-ধ্বংস বা ইমামদের গলায় শুয়োরের মাথা বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাবার সময়ও (সূত্র—দি এশিয়া উইক) এই অসহিষ্ণুতাই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। লেনিন বলেছিলেন, "এটি সত্যি যে, চীনারা ইউরোপীয়দের ঘৃণা করে। কিন্তু কাদেরকে ও কেন? .....খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের আড়ালে লুণ্ঠনের নীতি যারা গ্রহণ করেছে, তাদের ঘৃণা থেকে চীনারা কিভাবে বিরত থাকতে পারে?" (ইজরায়েল এপষ্টাইনের লেখা 'আফিম যুদ্ধ থেকে মুক্তি', পৃঃ ৬৮-৬৯। এবই পুস্তকে

প্রশস্তির সাথে লেখা হয়—"তারা সামন্ত কুনফুসীয় সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ চ্যালেঞ্জ করে (১৮৫০—১৮৬৫ সালের থাইপিং বিপ্লব প্রসঙ্গে—লেখক)। ...১৮৯৯—১৯০১ সালের কৃষক বিদ্রোহগুলো বিদেশী ও মিশনারী বিরোধী হয়ে ওঠে" (পৃঃ ২২)। কমিউনিষ্ট শাসনের দীর্ঘ সময়ে চীনে আহ্‌মদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম প্রচারের সুযোগ বিধিবদ্ধভাবেই অনুপস্থিত ছিল। কমিউনিজমের বিশ্বজোড়া স্বেচ্ছা পতনের কালে বেইজিং (চীন) থেকে সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তকেও এর পরিষ্কার স্বীকৃতি মেলে। এ ব্যাপারে নিম্নের উদ্ধৃতি উল্লেখ্য..... ... .. "দশ বছরের 'সংস্কৃতি বিপ্লবের' সময় অতি বামপন্থী হস্তক্ষেপে ধর্ম নিরোধ সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি অত্যন্ত গুরুতর পরিণতি সৃষ্টি করেছিল।.....সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দশ বছরের বিশৃংখলায় 'চার কুচক্রী' নগ্নভাবে ধর্ম সংক্রান্ত নীতি বানচাল করেছিল। ফলে দুই জাতির স্বাভাবিক ধর্ম ও জীবন গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল।... ... ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত দশ বছর ধরে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলার সময়ে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সংখ্যালঘু জাতিসংক্রান্ত নীতি এবং ধর্ম সংক্রান্ত নীতি গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল।.....বহু বছরের বিরতির পর, মক্কা শরীফে চীনের হজযাত্রীদের উপস্থিতি অন্যান্য দেশের হাজার হাজার হাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।" (চুনিং এর লেখা 'চীনের ইসলাম ধর্মাবলম্বী দশটি সংখ্যালঘু জাতি' পৃঃ ৮৪, ২৩, ৪১, ৪)।

বর্তমানে সেখানে ব্যাপক প্রচার কার্য চলেছে, একথা উল্লেখ করে ১৯৮৯ সালের ৯ই জুন তারিখে মসজিদে ফযলে প্রদত্ত খুতবায় আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) বলেন "কোন কোন দেশে জামা'ত নতুনভাবে পুনর্জীবন লাভ করেছে। যেমন চীন দেশের কয়েকস্থানে জামা'ত কায়েম হয়ে গেছে। কিছু উলামা চীনের বাইরে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ বয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন যে, দেশে গিয়ে তাঁরা ব্যাপক প্রচার করবেন। আমাদের মোবাল্লেগ মাওলানা মুহাম্মদ উসমান চীনী সাহেবের শ্বশুর সাহেব আহ্‌মদীয়াত কবুল করেছেন। চীনে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম প্রচারের কথা উল্লেখ করে হুযূর (আইঃ) ১৯৮৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনস্থ ফযল মসজিদে প্রদত্ত খুতবায় বলেন, "একজন চীনা জ্ঞানী পণ্ডিত বহির্দেশে থাকা কালে এরূপ এক আহ্‌মদীর দেখা পেলেন যিনি তাঁর কাছে ভিন্ন ধরণের বলে মনে হলো। যাঁর ভদ্রতা ও শালীনতা সবাক ছিল, যাঁর নৈতিক চরিত্রের মধ্যে মনোমুগ্ধকর চৌম্বক শক্তি সক্রিয় ছিল। সেই আহ্‌মদী মৌখিকভাবেও তাঁকে জ্ঞাত করতে লাগলেন যে, তিনি ভিন্ন রকম, কি আমাদের নৈতিক বিধি-বিধান যার ফলশ্রুতিতে তিনি তার মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং দীনে হক ইসলামের পরিচিতি তথা আহ্‌মদীয়াতের পরিচিতি এবং এর পরিণামে একটি বিশেষ উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত যা আমার সামনে রয়েছে তা এক ব্যাপক ভিত্তিতে চীনের সাথে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলো।

শুরুতে এসব যোগাযোগের কোন ইতিবাচক ফল পাওয়া গেল না। কিন্তু এখন আমাকে জানানো হয়েছে যে, এসব যোগাযোগের ফলে ঐ সব ব্যক্তিবর্গও সেখানে অনুসন্ধান করছেন খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং তাদের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতাদের কেউ কেউ তাদেরকে লিখেছেন যে—আমরা এখন যে অনুসন্ধান চালিয়েছি তাতে জানা গেছে যে, এ জামাতটিই প্রকৃতপক্ষে দীনে হক ইসলামের পতাকাবাহী জামা'ত এবং অনুসন্ধানে এত জানা গেছে যে, এ জামা'তটিই শান্তিপ্রিয় জামা'ত, যারা তলোয়ারের দ্বারা নয় বরং প্রেম ও মহব্বতের দ্বারা এবং পয়গামের দ্বারা মানব হৃদয় জয় করার পক্ষপাতি।

চীনে ইসলাম প্রচারে ব্যাপকভাবে অংশ নেয়ার জন্যে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা (আইঃ) চীনা ভাষা শিখার প্রতি বিশেষ করে নজর দিয়েছেন। চীনা, উইগুর, তুর্কী, কাজাখ, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদসহ বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে চীনের মানুষকে ক্রমাগতভাবে সত্যের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, চীনা ভাষায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিশ্বখ্যাত 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী' পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছিলেন হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক। এটার প্রকাশনার খরচও চীনা ব্যক্তিবর্গ জুগিয়েছিলেন। ইসলামের সেবায় চীনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৎপরতা আজ একটি স্বীকৃত বিষয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন লেখা প্রকাশকারী 'মাসিক পৃথিবী' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছে—"মুসলিম উম্মার শত্রু আহমদীয়ারা (কাদিয়ানী সম্প্রদায়) চীনা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।" (পৃঃ৪৫) এই উক্তিটি এই কথাই প্রমাণ করে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত চীনের দুর্গম অঞ্চলেও গিয়েছে এবং প্রচার তৎপরতা চালিয়েছে। এ উক্তি হলো সেই প্রচার তৎপরতার সনদ। কেউ এই প্রচার তৎপরতায় অসহিষ্ণু হয়ে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ইসলাম বা মুসলিম উম্মাহ্‌র শত্রু আখ্যা দিলেও সত্য তাতে মুছে যাবে না।

যুগে যুগে যখনই সত্যের প্রচার হয়েছে তখনই তার বিরোধিতাও হয়েছে—তাকে বিদ্রূপও করা হয়েছে। আলো আর আঁধারের যে সম্পর্ক, সত্য ও মিথ্যের সেই সম্পর্ক। এ দুটোকে এক সাথে মিলিয়ে দেয়া যায় না। আর সত্যের সাথে দ্বন্দ্বে মিথ্যে পালাতে দিশে পায় না। পরিণামে সত্যের জয় অনিবার্য। জয় অনিবার্য খোদার জামা'তের। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্‌ বলেন "ওয়াকুল জায়াল্‌হাক্কু ওয়াজাহাকাল বাতেল ইন্নাল বাতেলা কানা জাহুকা।" (বনী ইসরাঈল : ৮২)। অর্থাৎ "এবং তুমি বল, সত্যি এসেছে মিথ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যেতো বিলীন হবারই ছিল।" ইনশাল্লাহ্‌ চীনদেশেও পরিণামে সত্যেরই হবে বিজয় এবং মিথ্যে হবে বিলীন।

(অবশিষ্টাংশ ২৪ পাতায় দেখুন)

আহমদীয়াত একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক আন্দোলন

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোস্তাক আহমদ

(১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

যারা লোকশ্রুতিতে বিশ্বাসী, সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই যারা অন্ধের মতো ছুটেন, যাদের বাহির থেকে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ার অভ্যোস, তাদের সমীপে নিম্নলিখিত গল্পটি পেশ করছি :

উন্নত চরিত্রের এক ক্ষুধার্ত যুবক নদীতে ভেসে আসা একটি ফল ভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবারণ করেছিলেন। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর তার চেতনা জাগ্রত হলে, ফলের মালিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তিনি নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চললেন। এক সময় নদীর ধারে উক্ত ফলের একটি বাগান দেখতে পেলেন এবং ফলের মালিকের কাছে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থী হলেন। বাগানের মালিক একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সমস্ত ঘটনা জেনে উক্ত বুযুর্গ ব্যক্তি যুবককে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে সনাক্ত করলেন এবং বল্লেন, এক শর্তে তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। আমার একটি অন্ধ, কালা, নুলা ও কুৎসিত মেয়ে আছে, তুমি যদি নির্দ্বিধায় তাকে সাদী কর, তবেই তোমাকে ক্ষমা করবো। যুবক নিরুপায় হয়ে রাজী হলেন। বিয়ে হলো, বাসর ঘর রচিত হলো। যুবক বাসর ঘরে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়ে ফিরে এলেন। বুযুর্গ পিছনে দাঁড়িয়ে সহাস্যবদনে বল্লেন, 'ফিরে এলে কেন বাপু? ওটিই তো তোমার বাসর ঘর। তোমার জন্যই তো উহা অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়েছে।' যুবক বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে বললেন যে, নিশ্চয়ই তিনি অন্যের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। নইলে এরূপ অপরূপ সুন্দরী রমণী যার সৌন্দর্যে ঘর আলোকিত হয়ে আছে, এমন মহিলার সংগে তো তার বিয়ে হয় নি! তার তো বিয়ে হয়েছে একজন অন্ধ, কালা, নুলা ও কুৎসিত মহিলার সংগে। বুযুর্গ বললেন, যাকে দেখে তুমি তন্ময় হয়েছ, বিস্মিত হয়েছ, সে-ই তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। যুবক আরও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'এমন তো কথা ছিলনা?' বুযুর্গ তখন বললেন, 'আমি মোটেই মিথ্যে বলিনি। আমার মেয়ে অন্ধ এই অর্থে যে, জীবনে সে দু'চোখ নিয়ে পর পুরুষকে দেখেনি; কালা এই অর্থে যে, তার দু'কর্ণ দিয়ে অশ্লীল বাক্য শ্রবণ করেনি, নুলা এই অর্থে যে, তার হাত দিয়ে কোন জীবের অনিষ্ট সাধন করেনি, কুৎসিত এই অর্থে যে, কোন পুরুষ তাকে অদ্যবধি দর্শন করেনি।'

উপরোক্ত গল্পের মতোই যারা 'কাদিয়ানী' শব্দটি শুনেই নাস্তিক, কাফের, বেদীন ও অধার্মিক বলে দূর থেকে মনের মাঝে কুৎসিত ধারণা নিয়ে বসে আছেন, তাদেরে বলছি, আসুন, একবার অন্দরমহলে প্রবেশ করে দেখুন, সেখানে কত মনোরম বাসর ঘর রচিত

হয়েছে। আল্লাহ ও মুহাম্মদী নূরের অপরূপ ঝলকে সেই আহমদী বাসর ঘর ঝলমল করছে, আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। আপনার মলিন আত্মা চমকিত হবে। আপনি নতুন, উদার ও কুসংস্কার মুক্ত এক আলোকিত জীবনের সন্ধান পাবেন; দূর থেকে কাদা ছুঁড়বেন না।

গৃহের দরজা না খুললে যেমন সে গৃহে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না সেরূপ হৃদয়ের অর্গলকে বন্ধ করে রাখলে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃও সেখানে পৌঁছাতে পারে না। যারা জেনে শুনে ও বুঝে, অহংকারবশতঃ আল্লাহর অলী ও যুগ-ইমামকে অস্বীকার করবেন, বিরোধিতায় মেতে উঠবেন, এবং বেয়াদবির একশেষ করবেন, তাদের সম্পর্কে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহর তরফ থেকে সংবাদ পেয়ে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, "আমার বিরুদ্ধবাদীদের অশুভ হস্তকে আল্লাহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন এবং তাদের সকল অশুভ প্রচেষ্টাকে নির্মূল করে দিয়ে আমাকেই জয়যুক্ত করবেন।" পক্ষান্তরে তিনি ওহীর মাধ্যমে এই সুসংবাদও লাভ করেছেন, "রাজা বাদশাহগণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" তিনি চূড়ান্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, আমাকে অস্বীকার করা সহজ ব্যাপার নয়, আমাকে অস্বীকার করলে স্বয়ং খোদার প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত ঈমান হারাতে হবে। আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার প্রকাশ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর সত্যতার প্রকাশ। আমাতে যার বিশ্বাস নেই, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর তার বিশ্বাস নেই; রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর যার বিশ্বাস নেই, খোদার প্রতিও তার বিশ্বাস থাকেনা। সুতরাং পরিণামে তাকে কাফের হতে হবে। আমি খোদার সত্যতার প্রকাশ এবং খোদা আমার সত্যতার প্রকাশ। তিনি জানতেন ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষেরা তার প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত জামা'তের বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতায় মেতে উঠবে; তাই তিনি আল্লাহ হতে সতর্ক সংকেত লাভ করে বলেছেন, "হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ, হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ, হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংসের মুখে দেখতে পাচ্ছি; জনপদগুলোকে জনমানব শূন্য অবস্থায় দেখছি। সেই এক অ-দ্বিতীয় খোদা দীর্ঘ কাল যাবৎ নীরব ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে প্রকাশিত হবেন। যার কর্ণ আছে, সে শ্রবণ করুক; এ দেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। তোমরা নূহের যুগের ছবি স্বচক্ষে দেখবে। লূতের যুগের চিত্র তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আমি না আসলে, এসব বিপদরাশি আসতে বিলম্ব হত। কিন্তু আমার আগমনের সংগে খোদার গোপন ক্রোধ প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছে; আল্লাহ শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর। তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হবে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়া তলে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। (হকীকাতুল ওহী)।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ইহাই যে, একশত বৎসর পূর্বের এই মহাপুরুষের সতর্কবাণীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে মানুষ আপন খেয়ালে ছুটে চলেছে ; সংগে সংগে আল্লাহ্‌র শাস্তির ওয়াদাও পূর্ণ হয়ে চলেছে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম শিকার হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ, কারণ যুগ-ইমামকে অস্বীকার ও তাঁর বিরোধিতার ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম উম্মাহ্‌ই বেশী তৎপর রয়েছে এবং ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। কেননা, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সমস্ত মহামানবের জীবনে যে সত্যটি আমাদের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে, তা'হলো স্বজাতির দ্বারা তাঁদের প্রতি নিপীড়ন ও বিরোধিতা। সুতরাং শেষ যমানার প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না ; বিশেষ করে ইহুদী আলেমগণ যেমন ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করেছে, ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমরা যেমন মহানবী (সাঃ)-এর বিরোধিতা করেছে ; তেমনি মুসলমান আলেমরাও যে মাহদী (আঃ) এর বিরোধিতা করবে, এটাইতো ছিল ঐতিহাসিকভাবে স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে হাদীস দলীলও এই সাক্ষ্য দেয় যে, শেষ যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, তৎকালীন আলেমদের দ্বারা চরম বিরোধিতা ও উৎপীড়নের শিকার হবেন। কেননা, তখনকার আলেমগণ হবেন আসমানের নীচে বসবাসকারী জীবের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। (হাদীস) তাই মাহদী (আঃ) সতর্কতার সংগে এই উপদেশও দিয়েছেন যে, "তোমরা আমার বিরুদ্ধে লেগে যেয়োনা। তোমরা কী স্বয়ং খোদার সংগে যুদ্ধ করতে চাও ?"

প্রিয় পাঠক ! একবার পৃথিবীর মানচিত্রে চোখ বুলিয়ে দেখুন, মানচিত্র বদলে যাচ্ছে, পৃথিবী তার রং পাল্টাচ্ছে, আজকের পৃথিবী ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করতে যাচ্ছে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, শ্রীলংকা, ও সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম নিধন যজ্ঞ ; ইহুদী কর্তৃক ফিলিস্তিনীদের প্রতি উৎপীড়ন, ইরানের ভূমিকম্পে লক্ষ জীবনের জীবন্ত কবর রচনা ; সর্বোপরি, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ জীবনের সলিল সমাধি। ক্ষতিগ্রস্তরা প্রায় সবাই মুসলমান। বলাবাহুল্য মুসমানদের উপর এত বড় বড় বিপদ রাশি বিগত ১৪ শত বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে কি না সন্দেহ। আল্লাহ পাক আজও সামুদ জাতি সংগে যে ব্যবহার করেছিলেন, অনুরূপ ব্যবহারই করছেন মুসলমানদের সংগে ; নূহ ও লূত (আঃ)-এর কওমের সংগে যে ব্যবহার করেছিলেন তাদৃশ ব্যবহার দেখাচ্ছেন মুসলিম কওমের সংগে। মহানবী (সাঃ) শেষ যমানায় তাঁর উম্মতের উপর খোদায়ী কোপ ও গযবের ইশারা ইঙ্গিত লাভ করে অঝোরে চোখের জল ফেলতেন এবং বিগলিত চিত্তে উম্মতের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়ায় রত থাকতেন। তিনি বলেছেন, "সুরা হূদ আমাকে অকালে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" সূরা হূদে নবীদের বিরোধিতার কারণে উম্মতের দুরবস্থা ও ভয়াবহ দুর্যোগের বার্তা সন্নিবেশিত থাকলেও আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী ও বন্ধুকে এই সান্ত্বনাও দেন যে, শেষ যমানায় ধ্বংস যজ্ঞের পর ইসলামের এক বিকাশ হবে

এবং তা' হবে শেষ যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে। সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ যথাসময়ে আবির্ভূত হয়ে, স্বীয় পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পন্ন করে গিয়েছেন। তাঁর ইজ্জতের প্রতি অসম্মান, অবিচার এবং তাঁর পবিত্র খেলাফতের বিরুদ্ধাচরণ সর্বোপরি তাঁর মীমাংসা ও সংস্কারকে প্রত্যাখান করার বিষময় ফল দুনিয়ার ঘাড়ে বিশেষ করে করে, মুসলিম জাতির কাঁধে চেপেছে। এখনও সময় আছে তওবা করুন, বেশী বেশী করে এস্তেগফারে রত থাকুন এবং পবিত্র আহমদী খেলাফতের রজ্জু লৌহ দৃঢ়তায় শক্ত করে ধরুন এবং খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে এসে শরীক হোন; এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্‌র গযব থেকে বাঁচার একটি পথও বিশ্ববাসীর জন্য খোলা নেই। মুক্তির সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু একটি মাত্র দ্বার খোলা আছে, আর তা, হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর-আদর্শের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং তা যুগ ইমাম-ইমাম-মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) মসীহ মাওউদ বা ক্রুশ ধ্বংস কারীরূপে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্রুশ ধ্বংসকারীরূপে তিনি কাঠের ক্রুশ বা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রুশ ধ্বংস করতে আসেননি; এরূপ ক্রুশ তো হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে শুরু করে বিগত তেরশত বৎসর ব্যাপী ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন উপকার হয়েছে কি? বরং খৃষ্টান মতবাদ আরও প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। বিশ্বের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী এখন খৃষ্টিয় মতবাদে বিশ্বাসী। তাই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেন, "ক্রুশ ধ্বংসকারীরূপে আমি কাঠের ক্রুশ কে ধ্বংস করতে আসিনি বরং ক্রুশ মতবাদকে ধ্বংস করতে এসেছি।" তিনি খৃষ্টানী ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্তবাদ ও অন্যান্য অসার মতবাদকে শাণিত কৃপাণ যুক্তির দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করে বিশ্বের বুকে ইসলামের সৌন্দর্য ও মহিমাকে তুলে ধরেছেন। তিনি কোরআন করীম ও হাদীসের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, ঈসা (আঃ) আসমানে সশরীরে জীবিত নেই। অন্যান্যদের মতো তাঁরও ওফাত হয়েছে। খৃষ্টানী অন্ধ-বিশ্বাসের সংগে সুর মিলিয়ে যে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমানে সশরীরে আছেন এবং একসময় মুহাম্মদী উম্মতকে রক্ষার জন্য ধারাধামে নেমে আসবেন, তাদের লক্ষ্য করে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেন, 'ঈসা (আঃ) আসমানে জীবিত নেই এবং কোন দিনও আর তিনি এই ধরাধামে ফিরে আসবেন না; যার আগমনের কথা ছিলো সে ব্যক্তি আমি; আপনারা যত খুশী আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুন; আপনাদের চক্ষু ক্লান্ত ও অসার অবসন্ন হয়ে আসবে। কিন্তু কোন ঈসা নবীকে আসমান থেকে নামতে দেখবেন না; অনুরূপ আপনাদের সন্তানেরাও দেখতে পাবে না, এমনিভাবে পরবর্তী বংশধরেরা কেউ তাঁকে আসমান থেকে নামতে দেখবে না; এই ব্যর্থ আকাংখার মধ্যেই তাদের মৃত্যুর ডাক এসে যাবে। কিন্তু কেউ তাঁকে আসমান থেকে নামতে দেখবে না; পৃথিবীর মানুষেরা তখন আমার কথা বিশ্বাস করবে।'

আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে খৃষ্টানী মতবাদ যখন সারা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছিলো, খৃষ্টানের রাজত্বে যখন সূর্য অস্ত যেতোনা ; যখন তারা ইসলামের নাম নিশানাকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো ; তৎসংগে চালিয়েছিল জোর খৃষ্টীয় মতবাদের প্রচারণা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের সুমহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র চরিত্রের উপর কলঙ্কারোপসহ নানাবিধ অপ-প্রচার পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতেছিল ; ইসলামের কর্ণধার তৎকালীন আলেম সমাজ যখন খৃষ্টানী মতবাদ প্রচারের জোয়ারের কাছে খর কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল ; অসংখ্য আলেম তথা সৈয়দ বংশেরও বহু লোক যখন স্বীয় পবিত্র ইসলাম ধর্মকে জলাঞ্জলী দিয়ে খৃষ্ট ধর্ম আগ্রহে গ্রহণ ও বরণ করে নিচ্ছিল, একমাত্র মক্কা ও মদীনা ব্যতিরেকে সমগ্র পৃথিবীতে যখন ইসলামের নাভিশ্বাস উঠেছিল ; ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) খোদার নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে নিজেকে শেষ যমানার প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ উপাধি লাভ করে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, "শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে পুনরায় মাতৃগর্ভে ফিরে যায় না, অনুরূপভাবে, প্রগতির ধারায় খৃষ্টান ধর্মের ভিতর দিয়ে ইসলামের আগমন ও যৌবন লাভের পর উহা পুনরায় খৃষ্টান ধর্মে ফিরে যাবেনা ; প্রয়োজনবোধে, আমি একাই এ-অবস্থার মোকাবেলা করবো।' তিনি বিজয়ীর বেশে, সফলতার সাথে, অত্যন্ত সার্থকভাবে খৃষ্টান পাদ্রীদের মোকাবিলা করেছিলেন।

আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে স্বার্থকভাবে প্রতিহত ও পরাভূত করেছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। সেদিন শত শত পাদ্রী খৃষ্ট ধর্মের পতাকা ফেলে দিয়ে, মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ-এর মোবাহাসার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে, তাঁর নাগপাশ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সকল ধর্মের ধর্মযাজকেরা সেদিন নিরাশ হয়ে মুখ থুবরে পড়েছিল। সেদিন তিনি সুদূর ইংল্যাণ্ডের মহারাণী ভারত সম্রাজ্ঞীকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে পারলৌকিক মঙ্গল, সম্মান ও মুক্তি লাভের জন্য সুদীর্ঘ পত্র যোগে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যখন পৃথিবীর সিংহভাগ এলাকাসহ মহারাণীর প্রশাসনের অধীন ছিলো। সেদিন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করে ছিলেন, "সমগ্র পৃথিবীর মোকাবেলায় আমি একাই জয়যুক্ত হবো।"

যারা ধারণা করেন এবং অপপ্রচারে বিশ্বাস করেন যে, 'আহমদীয়াত' ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের ফসল অথবা 'মির্যা গোলাম আহমদ' সাহেব ইংরেজদের বানোয়াট নবী ; তারা জেনে রাখুন যে, গোলাম আহমদ (আঃ) সরাসরি কোন নবী হওয়ার দাবী করেননি, তিনি মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন ; মাহদী (আঃ) অবশ্যই খৃষ্টানদের নবী ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে বড় ; কেননা, হাদীস একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, মাহদী (আঃ) শেষ যমানায় সকলের ইমাম হয়ে আসবেন।

দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে কখনও খৃষ্টানী নবী ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হতে পারে না, মুহাম্মদী উম্মতের সংশোধনের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদা ও

ইজ্জতের পরিপন্থী ; কেননা ঈসা (আঃ) ছিলেন একজন শরীয়তবিহীন নবী। প্রকৃত পক্ষে দলীল অনুযায়ী সত্য এই যে, মুহাম্মদী উম্মতের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য মুহাম্মদী মসীহর আগমন মুহম্মদী উম্মতের মধ্য হতে হওয়া অবধারিত ; সুতরাং হাদীস অনুযায়ী "লাল মাহদী, ইল্লা ঈসা 'অর্থাৎ ঈসা ভিন্ন মাহদী নাই ; অর্থাৎ যিনিই মাহদী তিনিই ঈসা' ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, মুসায়ী মসীহর চেয়ে মুহাম্মদী মসীহ বড়। একথা যিনি বিশ্বাস করবেন না, তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত হওয়ার যোগ্য নন। কেননা, মুসা (আঃ)-এর চেয়ে যেমন মুহাম্মদ (সাঃ) বড় ; তেমনি মুসায়ী মসীহর চেয়ে মুহাম্মদী মসীহ বড় ; আল্লাহতা'লার এই চিরন্তন বিধানের কোন হের ফের হতে পারেনা। জমিদারের চাকরের চেয়ে যে সম্রাটের চাকর বেশী সম্মানীত হবেন, ইহাই প্রাকৃতিক সত্য ; তবে জেদ কোন যুক্তি মানে না। ঈসা (আঃ) এসেছিলেন মুসায়ী মসীহরূপে মুসায়ী শরীয়তের সংশোধনের জন্য ; তিনি পুনরায় মুহাম্মদী শরীয়তের সংশোধনের জন্য আসতে পারেন না ; কিন্তু যিনি আসবেন, তিনি হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন উম্মত ; তিনি হবেন শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং তিনি মুহাম্মদী মসীহ হয়ে আসবেন, তিনি মর্যাদায় হবেন মুসায়ী মসীহর চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। এখন কথা হলো ; যিনি শেষ যমানায় মুহাম্মদী উম্মতের জন্য মীমাংসাকারী, সংস্কারক ও ইমাম হয়ে আসবেন, তিনি যদি খৃষ্টানী নবী ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে মর্যাদায় বড় হয়ে আসেন, এবং তিনি যদি বলেন যে, আমি একাধারে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন শ্রেষ্ঠ উম্মত তথা পূর্ব যুগের নবী ঈসা (আঃ) এর চেয়েও মর্যাদায় বড় যা কিনা হাদীস অনুযায়ী স্বীকৃত যেমন, "আমার কতক উম্মত পূর্ব যুগের নবীদের চেয়েও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হবে' (হাদীস) তবে কি তিনি উম্মতের ভিতর থেকে শরীয়তবিহীন নবীর মাকামপ্রাপ্ত বলে অভিহিত হতে পারেন না ? সত্য যুক্তি কি একথাই সাক্ষ্য দেয় না ? যুক্তিবিহীন যে জ্ঞান তা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ ; এতবড় মর্যাদা ব্যতিরেকে আমরা কি তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবো ?

অনেকে একটু বাড়াবাড়ি করে একথা বলে থাকেন যে, মাহদী (আঃ) সাদা ঘোড়ায় চড়ে জেরুজালেমের মসজিদে প্রথম প্রবেশ করবেন এবং তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধ করে দখল করে নিবেন। এ সব অবান্তর কাহিনী বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও পীর সাহেবদের মুখেও শুনি ; ফলে তা সাধারণ মানুষের দৃঢ় মূল বিশ্বাসে পরিণত হয়ে আছে। সবচেয়ে বেশী দুঃখ এই সব আলেম ও পীর সাহেবদের জন্য যারা নিজেরাই কুসংস্কারে নিমজ্জিত এবং বাকী সমাজটাকেই কুসংস্কারের এক অন্ধ গহ্বর ঝুড়িতে পরিণত করতে চায় ; কিন্তু জেনে রাখুন, কল্পনা কোনদিনও সত্যের স্থান অধিকার করতে পারে না। কুরআনের এই শাশ্বতবাণীকে কেউ রদ করতে পারবে না। "যুক্তিতে যিনি পরাজিত হন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরাজয় বরণ করেন।" আমরা কোন্ যুগে বাস করছি, গভীরভাবে একবার তলিয়ে দেখা দরকার। যে যুগে ঘোড়া ও উটের প্রচলন একেবারে উঠেই গেছে বলা চলে ; বিনিময়ে চালু হয়েছে উড়ন্ত ঘোড়া অর্থাৎ রকেট, উড়োজাহাজ ; চালু হয়েছে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক

উট অর্থাৎ রেলগাড়ী, মটরগাড়ী, ইত্যাদি। তীর ও তরবারীর বিনিময়ে চালু হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র, স্কার্ড ক্ষেপণাস্ত্র, দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। সেখানে নাকি মাহদী (আঃ) ঘোড়ার চড়ে যুদ্ধ করবেন এবং তরবারি দিয়ে ফুঁ দিয়ে বিশ্বকে জয় করে ফেলবেন এবং বর্শা দিয়ে দাজ্জালকে ধরাশায়ী করবেন। এ সবই তিনি করবেন। বিশ্বকেও জয় করবেন, দাজ্জালকেও বধ করবেন, বন্ধু আপনারা যেভাবে কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরেছেন, সেভাবে নয়, অন্যভাবে। এসব বিবরণ আপনারা জন সমক্ষে আর তুলে ধরবেন না, কারণ এতে মানুষ ঈমান হারাবে বৈ বৃদ্ধি পাবে না। মহানবী (সাঃ)-এর চেয়ে মাহদী (আঃ) বড় হয়ে আসবেন না; বরং গোলাম হয়ে আসবেন; সুতরাং প্রভুর চেয়ে গোলাম কস্মিনকালেও বড় নিদর্শন দেখাতে পারে না। 'ফুঁ' দিয়ে যদি বিশ্ব জয় করা যেতো তবে তা মহানবী (সাঃ)-এর জন্যই প্রযোজ্য ছিলো, মাহদী (আঃ)-এর জন্য নয়; আর ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যতটুকুন যুদ্ধের প্রয়োজন ছিলো; নবী করীম (সাঃ) সংবিধান অনুযায়ী তা' করে গেছেন, এখন আর যুদ্ধ নয়; বলুন শান্তি। মাহদী (আঃ) যুদ্ধ করতে আসবেন না; বরং যুদ্ধ রহিত করতে আসবেন। ইসলামী শিক্ষা, আলো ও আদর্শের মাধ্যমে বিশ্বকে জয় করবেন এবং ঐশী আলোর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বিশ্ব আলোকিত হবে এবং যুক্তির বর্শা দ্বারা ঐশী জ্ঞানে সজ্জিত ঘোড়ায় আরোহণ করে তিনি দজ্জালকে বধ করবেন।

সাধারণ জ্ঞান আমাদের এ কথাই সাক্ষ্য দেয় যে, ঘুষ দিয়ে কাউকে নবীও বানানো যায় না, এবং কাউকে কবিও বানানো যায় না। চেষ্টা করেও কেউ কোন দিন কবি হতে পারেন নি এবং নবীও হতে পারেন নি। এতদোপলক্ষ্যে যদি কেউ চেষ্টা করেও তবে বাচ্য ও কর্মের মধ্যে প্রভাব বিদারী শক্তি থাকে না; ফলে আয়ু ক্ষীণ হয়ে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। অতীতের ঘটনা প্রবাহ এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে। মিথ্যা নবীর দাবীদারদের শোচনীয় পরিণতি এবং মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে তাদের এই ধরাধাম থেকে নিঃশেষ হওয়ার ঘটনা আমরা জানি; কিন্তু সত্যকে রক্ষা করেন স্বয়ং সত্য খোদা, যে তাঁর বিরোধিতা করে সেই বরং ধ্বংস হয়ে যায়। এতদোপলক্ষ্যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঘোষণা করলেন, "সমগ্র জগৎ অবিশ্বাসী হলেও সত্য চিরকালই সত্য এবং সমগ্র জগৎ সমর্থনদারী হলেও মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা।" তিনি চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বললেন, টিকে থাকাই সত্যতার প্রমাণ।

আজ পৃথিবীর দিকে দিকে চোখ বুলিয়ে দেখুন, একশত বছরের ব্যবধানে আহ্‌মদীয়াতের স্বর্গীয় আলোর ছটায় কুসংস্কারের দিগন্তে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে; পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এর মিশন, দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে এর তৎপরতা। এর অপ্রতিহত অগ্রযাত্রায় ইসলামের মর্যাদা ও বিকাশ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ এই দৃঢ়মূল পৃথিবীতে

জামা'তের মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই; কেননা এর সাথে রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাত; স্বয়ং আল্লাহই তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর বীজ বপন করেছিলেন। তাই কুসংস্কার, জেদ, অহংকার, ভুলে গিয়ে সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ ও বরণ করে নেয়ার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। আসুন, পৃথিবীর মানুষেরা হাতে হাত রাখি, সত্যকে সনাক্ত করতে শিখি, মতভেদ ভুলে যাই, যুগ-ইমামকে মেনে নিয়ে ইহকাল ও পরকালে সম্মানীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

আমরা জানি যে, সচেতন কোন ব্যক্তি স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণ হতে চান না। আপনি কি বলতে চান অষ্টাদশ শতকের তথাকথিত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সভ্য জ্ঞানী ইংরেজ জাতি, যারা সারা দুনিয়ার বুকে আধিপত্য বিস্তার করে ছিলো তারা কি নিজেরাই নিজেদের খৃষ্ট ধর্মের মর্মমূলে কুঠারাঘাত হানার জন্যে—গোলাম আহমদ সাহেবকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তো এ কথা ঘোষণা দিয়েই আত্ম প্রকাশ করলেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে যেসব মহান কর্ম সম্পাদনের জন্য পাঠিয়েছেন তার মধ্যে একটি কর্ম তো এই যে, 'শেরকে নিমজ্জিত প্রায়শ্চিত্যবাদী খৃষ্টান ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা তথা সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মকে জয়যুক্ত করে দেয়া।' এতদোপলক্ষ্যে তিনি তাঁর জীবনের মহামূল্য সাধনাকে কুরবান করে দিয়েছেন। ১৮৯৬ ইসাব্দে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব ধর্মীয় মহা সম্মেলনে চূড়ান্ত ধর্মীয় প্রতিযোগিতায় তাঁরই রচিত 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফি' গ্রন্থটি সকল ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং কুরআন করীমের পরম সৌন্দর্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মহা ভাণ্ডার উন্মোচন করে দিয়ে এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, জগতে একমাত্র ইসলাম সত্য আর কুরআন করীমের শিক্ষা ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ ব্যতিরকে মানব জাতির শক্তি আর কোথাও নেই। ইসলামের এই মহান বিজয় শেষ যমানায় একমাত্র এই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জন্যই নির্ধারিত ছিলো। সেদিন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এই ঘোষণাই দিয়েছিলেন যে, স্বীয় ইজ্জত ও গৌরবের জন্য আমি মোটেই লালায়িত নই—বরং আমি আকাংখিত সেই ইসলামের গৌরবের জন্য—যা আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আজ থেকে তেরশ' বছর পুর্বে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

উপরোক্ত বাণী ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা কি একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের ফসল ছিলেন, না কি তিনি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তথা ধর্মসমূহের কুসংস্কারের মোকাবেলায় আল্লাহর কর্ম কৌশলের ফসল ছিলেন, এ প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমার রইলো।

যেসব মহান উদ্দেশ্য ও কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁর আগমন ঘটে ছিলো তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ কোরআন করীমের গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান, প্রকৃত সৌন্দর্য ও সঠিক ব্যাখ্যা মানব জাতির কাছে পেঁৗছে দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত মর্যাদা, মাকাম ও মহিমা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা।

তৃতীয়তঃ সকল ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করে দেয়া এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

চতুর্থতঃ ক্রুশ ধ্বংস করা অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা।

পঞ্চমতঃ ধর্মের নামে দাঙ্গাবাজি ও যুদ্ধ রহিত করা।

ষষ্ঠতঃ ইসলাম প্রচারের জন্য তথা ইসলামের মর্মবাণী বিশ্বের অসংখ্য ভাষাভাষী মানুষের দুয়ারে পেঁৗছে দেয়ার জন্য একটি শক্তিশালী ইসলামী মিশন প্রতিষ্ঠিত করা।

উক্ত ইসলামী মিশনের নামকরণ করা হয়েছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত; যাকে আমি প্রথমেই পবিত্র আধ্যাত্মিক আহমদী আন্দোলন বলে অভিহিত করেছি। ইহা স্বয়ং খোদার প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। এই জামাতের সংগে বিরোধিতা করলে স্বয়ং খোদার সংগে বিরোধিতা করা হয়; যে সেই বিরোধিতা করুক না কেন; হোক সে আলেম হোক সে কামেল, হোক সে খৃষ্টান-ইহুদী-পাদ্রী, হিন্দু-বৌদ্ধ বা জরাথুস্ত্র কেউ আল্লাহর কোপ থেকে রক্ষা পাবেনা; কেননা, এর সাথে রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর দৃঢ় ঐশী হাতের পরশ, যেমন আল্লাহ পাক কোরআন করীমে ঘোষণা করেছেন, "তারা আমার নূরকে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আমি আমার নূরকে প্রজ্জলিত করিয়াই ছাড়িবো।" সুতরাং সূক্ষ্ম সতর্কতার সংগে এর বিরোধিতা করতে আসবেন, নইলে ঈমান হারাতে হতে পারে।

আজ সারা পৃথিবীতে একমাত্র খেলাফত যার মাধ্যমে এই ইসলামী মিশন জারী রয়েছে। এর মাধ্যমেই পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামের পবিত্র প্রচার পেঁৗছে দেয়া হচ্ছে; যা একমাত্র এই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য নির্ধারিত ছিলো। আসুন, আমরাও ইসলামের এই সুশীতল খেলাফতের রজ্জু ধরে মুক্তি অনন্ত আশ্রয় খুঁজি।।

অনিবার্য কারণবশতঃ পাক্ষিক আহমদী ১৪শ ও ১৫শ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত। কর্তৃপক্ষ

কাদিয়ানের শততম সালানা জলসা

(দুই)

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

হাম আ মিলেঙ্গে মতওয়ালো
বস্ দের হ্যায় কাল ইয়া পরসুঁ কি
তুম দেখোগে তো আঁখে ঠাণ্ডি
হোগি দের কি তরসেঁা কি

... ...

তুম দূর দূর কে দেসূঁ সে
জব কাফেলা কাফেলা আওগে
তো মেরে দিল কে খেতোঁসে
ফলেগি ফসলে সুরজেঁা কি :

—আমরা এসে মিলিত হব, তবে কাল অথবা পরশু পর্যন্ত দেরী হতে পারে। তোমরা যখন তা দেখতে পাবে তখন তোমাদের অপেক্ষারত চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। দূরবর্তী দেশ-সমূহ থেকে কাফেলা আকারে যখন আসবে তখন আমার হৃদয়ক্ষেত্রে সূর্যের ফসল ফলবে [খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আই:)]

কাদিয়ানের শততম সালানা জলসায় যাতে বাংলাদেশের আহমদীরা যোগদান করতে পারে সে জন্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মজলিসে আমেলার মিটিং এ আমাকে কনভেনার করে একটি কমিটি গঠন করেন। আমরা ইচ্ছুক যাত্রীদেরকে ভাড়ার টাকা জমা দেবার জন্য, পাসপোর্ট নিয়ে আসার জন্য আহমদী পত্রিকা, সার্কুলার এবং বার বার এলানের মাধ্যমে আহ্বান জানাই। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৫৪ জন নারী-পুরুষ আমাদের কাছে নাম লিপিবদ্ধ করেন। কাদিয়ান থেকে প্রেরিত দাওয়াত নামা প্রত্যেক ভিসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদান করি। ভারতীয় দূতাবাস থেকে ভিসা ফরম এনে পূরণ করে ভিসা অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করে অতি সহজেই ভিসা প্রাপ্ত হই। এজন্য দূতাবাসের ভিসা বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

নানাভাবে যোগাযোগ করে হাওড়া থেকে অমৃতসর পর্যন্ত ১২৩টি সিট রিজার্ভ করি। কলিকাতা জামা'তকে এজন্য শুকরিয়া জানাই। কাদিয়ানের সঙ্গে পূর্বাহ্নে যোগাযোগ করে ফেরত আসার জন্য আরো ৯৬টি সিট রিজার্ভ করিয়ে রাখি। যাত্রীদের অনেকেই একসঙ্গে ফিরবেন না এই ধারণার ফলে ফেরত আসার জন্য ১২৩টি টিকেট না করে ৯৬টি গ্রুপ টিকেট করি। আসা যাওয়ায় সব টিকিটই ছিল গ্রুপ টিকেট। আমাদের ভাষায় বলতে গেলে

জামা'তি টিকেট। এই টিকেট নামে নামে হাতে হাতে দেয়া সম্ভব নয়। কাদিয়ানে প্রতিটি রিজার্ভ টিকেটের জন্য পনর টাকা করে সার চার্জ ধরা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, যারা জামাতি-ভাবে টিকেট না করে ব্যক্তিগত চেষ্টায় টিকেট করেছিলেন তারা শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করেন।

জামাতের মধ্যেই যে বরকত নিহিত তা এবারের সফরে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। যাবার আগে আমীর সাহেব নসিহত করে বলেন যে, সবাই যেন আমীরে কাফেলার নির্দেশ মান্য করে চলে। তিনি বলেন, আমীর একাধিক হয় না একজনই হয়। আর এই একের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষাও তাই। একজন হাবশী, অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি আমীর হলেও তাকে মান্য করা বাধ্যতামূলক। ইয়াদুল্লাহে ফাওকাল জামা'ত। অর্থাৎ আল্লাহর হাত জামা'তের উপর। যারা জামা'ত থেকে দূরে থাকবে তারা আল্লাহ্‌র হাতের ছায়ার নীচে থাকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। আমীর সাহেব অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে এই কাফেলার আমীর নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, এই কাফেলায় নায়েব আমীর (১) এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আমীর সাহেবান ছিলেন। উল্লেখ না করে করে পারছিনা, এই সফরে নায়েবে আমীর ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের আনুগত্য ছিল ইসলামী আদর্শের পূর্ণরূপ। সফরে বহু নবীন ও প্রবীণ আহমদী আমাকে নানাভাবে সাহস দিয়ে, দোয়া দিয়ে সাহায্য করেছেন। যাজাহুমুল্লাহ।

যাবার আগে কাফেলার সদস্যদেরকে আমি মৌখিকভাবে এবং সার্কুলার মারফত জানিয়ে দেই যে, সঙ্গে কম্বল এবং শীত-বস্ত্র নিতে হবে। পানির পাত্র, বাতাস ভর্তি বালিশ, শুকনা খাদ্য ইত্যাদিও নিতে হবে। কাফেলার সঙ্গে না গেলে বনগাঁও যাবার পথে ডলার ছিনতাই হতে পারে। যারা এর অন্যথা করেছেন তারা অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সফরে কষ্ট সহ্য করতে হয়, একথাও সকলকে জানিয়ে দিই। ১৯শে ডিসেম্বর রাতে আমরা কাফেলা আকারে গাবতলী থেকে কয়েকটি বাসে করে বেনাপোল যাত্রা করি। ২০ তারিখ বর্ডার পার হয়ে কলিকাতা আঞ্জুমানে পৌঁছি। যাত্রা করার আগে ঢাকায় আমরা একটি খাসী সদ্‌কা করে যাই। কলিকাতা গিয়ে কাফেলার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দেড়শো। এত বড় কাফেলা ইতিপূর্বে আর কখনও বাংলাদেশ থেকে কাদিয়ান বা অন্য কোথায়ও যায় নি। ঐতিহাসিক জলসায় এই কাফেলাও ছিল একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী কাফেলা। ২১ তারিখ তিনটি বাস রিজার্ভ করে আমরা নিউ পার্ক স্ট্রিট আঞ্জুমান থেকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছি। কলিকাতা এবং উড়িষ্যা জামাতের বেশ কিছু বন্ধুও আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। মালপত্র বহনের জন্য কলিকাতা জামাত একটি ভেন প্রদান করে। দুইরাত দুইদিনের যাত্রা শুরু হল ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে। খোদ্দামরা সারা পথ পাহাড়া দিয়ে, ষ্টেশনে খাদ্যদ্রব্য এবং পানি সরবরাহ করে সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গ্রুপ টিকেটে যেমন সুবিধা আছে তেমনি

কিছু অসুবিধাও আছে আর, সি টিকেট নিয়ে। এসব পদ্ধতি আমাদের দেশে নেই বলে আমাদের লোকদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। এ দেশের সফর তিনশত মাইলের পারাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের ঐ সফর এক যাত্রায়ই ছিল প্রায় দেড়হাজার মাইল। দেশ হিসাবে ভারত একটি হলেও তাতে বৈচিত্র অনেক। আকৃতি, ভাষা, সংস্কৃতি আর ধর্মের এক বিচিত্র সমাবেশ। আমরা যাচ্ছি—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

২৩ তারিখ ভোরবেলা আমাদের গাড়ী গিয়ে থামল লুধিয়ানা ষ্টেশনে। এই সেই লুধিয়ানা যেখানে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। শত বৎসর পূর্বের এই ক্ষুদ্র জামাতটি আজ পৃথিবীর ১২৬টি দেশে বহু শাখা বিস্তার করে প্রতিষ্ঠিত। হাদীসে এই লুধিয়ানাকে বলা হয়েছে বাবে লুদ। এখানেই দাজ্জালকে বধ করবেন প্রতিশ্রুত মসীহ। ১৮৩৪ সালে এই লুধিয়ানা শহরে প্রথম খৃষ্টান মিশন অর্থাৎ দাজ্জালের আখড়া স্থাপিত হয় (History for Protestant Missions in India, P 218)। আর এর পরের বৎসর ১৮৩৫ সালে কাসেরুস্ সালীব মসীহ মাওউদ (আঃ) এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি এই বাবে লুদ (লুদী বংশের শাসকরা এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন) অর্থাৎ বর্তমান লুধিয়ানাতেই কাস্‌রে সলীব বা ক্রুশ ধ্বংসের গোড়া পত্তন করেন। আহমদী জামাত আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তৌহীদের পতাকা নিয়ে ত্রিত্ববাদকে পরাভূত করছে। যে শূল বনী ইসরাঈলী মসীহের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল মোহাম্মদী মসীহের সৈনিকদল সেই শূল ভাঙ্গায় রত। আল্লাহ্‌র কুদরত দেখুন, লুধিয়ানা ষ্টেশনে পত্রিকাওয়ালা এসে উঠল আমাদের বগীতে। 'হিন্দ সমাচার' পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখতে পেলাম, 'হযরত ঈসা মসীহকা দুবারা যহুর' অর্থাৎ ঈসা মসীহের (আঃ) দ্বিতীয় আগমন বিষয়ে সংবাদটি। এতে বলা হয়েছে, জার্মানীর খৃষ্টান নেতা এবং গবেষক বেনজেল আল ব্রেচট (মৃত্যু ১৭৫২) ঈসার (আঃ) আগমন ১৮৩৬ সালের গরম মৌসুমে হবে বলে মত প্রকাশ করে গেছেন (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনীকা)। এই প্রবন্ধে এও বলা হয় যে, যখন সমগ্র খৃষ্টজগৎ যীশুর জন্য প্রতীক্ষারত তখন ১৮৩৫ সালে মির্যা গোলাম আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তীকালে ঘোষণা করেন যে, তিনি দ্বিতীয় মসীহ। তিনি তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন নামক পুস্তকে ঘোষণা করেন যে, ঈসা (আঃ) কখনও আকাশ থেকে নাযিল হবেন না। বংশের পর বংশ গত হয়ে যাবে, ক্রুশের প্রভাবও জগৎ থেকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর জ্ঞানীরা ঈসার (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণের মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিহার করবে। পত্রিকাটি আমাদের জন্য ছিল একটি উপহার তুল্য। জামাতের সূতিকাগৃহ লুধিয়ানায় এহেন প্রবন্ধ প্রাপ্তি আমাদের সফরকে সার্থকতা প্রদান করে। মনে পড়ে ১৯৭০ সালে আমি সৌদী আরবের মাটিতে পা দিয়েই যে পত্রিকাটি পাই তাতে হামবুর্গ শহরের আহমদীরা মসজিদের ছবি ছাপা ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে এইসব আকস্মিক ঘটনাকে ঐশী পুরস্কার (দান) বলে মনে করি।

২৩ তারিখ সন্ধ্যার পর আমাদের কাফেলা ট্রেনযোগে কাদিয়ান পৌঁছে। ট্রেন থেকে মিনারাতুল মসীহ দেখা মাত্রই আমরা ইজতেমায়ী দোয়া করে নিলাম। প্রতিটি আহমদীর হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা কীর্তন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করতে করতে আমরা কাদিয়ানের মাটিতে পা রাখলাম। নীল আকাশে তখন পূর্ণ চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর বন্যা। কাদিয়ান তখন দু'টি চাঁদের আলোয় ভাসছে। একটি আকাশের চাঁদ অপর চাঁদ এই যমীনের হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আঃ)। তাঁর চাঁদের মত চেহারা আকাশের চাঁদকেও হার মানায়। সুর ধরে ইচ্ছা করে,—

তালায়াল বাদরু আলায়না
মিন সানিয়াতিল বেদায়ী
ওয়া জাবাশ্‌ শুকরু আলায়না
মাদায়াল্লাহা দায়ী।

ষ্টেশন থেকে বের হয়েই দেখলাম রাস্তাগুলি বাস ট্রাক চলার কারণে গর্ত হয়ে গেছে। মসীহে মাওউদ (আঃ) শত বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মানুষের আগমনের ফলে রাস্তায় গর্ত হয়ে যাবে। বাংলাদেশীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল নব নির্মিত বুয়ূতুল হাম্‌দে। ৪, ৫, ৬ এবং ৭ নম্বর দালান এবং পাঁচটি তাবুতে থাকার ব্যবস্থা ছিল। শীত বেশী থাকায় ষ্টোর থেকে লেফ, তোষক এবং বালিশ সংগ্রহ করে কাফেলার লোকদের মধ্যে বিতরণ করে রাত বারটার পর ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। হাজার হাজার লোকের জন্য দুবেলা ফ্রি খাবার দেয়া হচ্ছে মসীহে মাওউদের (আঃ) লঙ্গরখানা থেকে। একবেলা ভাত বা রুটি ডাল, একবেলা ভাত বা রুটি গোস্ত। তৎসঙ্গে রয়েছে গরম চা। আধুনিক পায়খানা এবং গোসলখানার সুব্যবস্থা। আমাদের আবাসস্থলটি ছিল জলসা গৃহের সব চাইতে নিকটবর্তী নিউ কলোনীতে। জলসা গাহ তৈরী হয়েছে মসজিদে নাসের এর সম্মুখস্থ প্রশস্ত মাঠে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দূর দেশের মেহমানরা ছিলেন নব নির্মিত আধুনিক গেষ্ট হাউসে। এই সব গেষ্ট হাউস ইউ, কে, জার্মানী, কানাডা এবং ইউ, এস, এর জামাত তৈরী করেছে। মেহমানদের জন্য এই জলসা উপলক্ষ্যে তৈরী হয়েছে আড়াই কোটি টাকার গৃহ। কাদিয়ান নব সাজে সজ্জিত হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য। দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌ চাহেত এখন প্রতি বৎসর হুযুর (আইঃ) আসবেন স্থায়ী কেন্দ্র কাদিয়ানে।

কাদিয়ানের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে মসীহে মাওউদের (আঃ) পারিবারিক বাসস্থান, মসজিদে মোবারক, মসজিদে আকসা, বয়তুদ দোয়া, বয়তুল ফিকর, মিনারাতুল মসীহ, বেহেশ্‌তি মকবেরা প্রভৃতি। সাদা মর্মর পাথরে তৈরী মিনারাতুল মসীহ রাতের আলোক সজ্জায় এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছিল। সমগ্র আহ্‌মদী মহল্লা ছিল নানা রঙ্গের বাতিতে উজ্জ্বল। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। নানা রং ও আকৃতির মানুষ। নানা ভাষায় কথা

বল্লেও তাদের হৃদয়ের আবেগ এক ও অভিন্ন। মসজিদে আকসা এতই ক্ষুদ্র হয়ে গেছে যে, মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়েও নামাযের স্থান পাচ্ছে না। অবশ্য জলসা চলা কালে মাঠেই নামায আদায় করা হয়েছে। জামা'তের দফতরগুলি দিন রাত কর্মরত। বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এসেছেন তারা কেউ নিজেকে মেহমান মনে করছেন না, কারণ এই কাদিয়ান হল সকল আহ্‌মদীর আপন ঘর। এখানে তাই কেউই কসর নামায পড়ে না। রাস্তায় চলাচল কালে চেনা অচেনা সবাই সবাইকে আস্‌সালামু আলায়কুম সম্ভাষণ জানাচ্ছে হাসি মুখে। সবাই সবার আপন জন। আমাদের পল্লী কবির ভাষায় বলা যায়,—

নানাবরণ গাভীরে, একই বরণ দুধ
এ জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) রুইয়াতে (স্বপ্নে) দেখেছিলেন, কাদিয়ানে বড় বড় ব্যবসায়ীরা দোকানে বেচা কেনা করছে। এবার সেই দৃশ্য বাস্তবে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। কাদিয়ানের বাজারে এবার লক্ষ লক্ষ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয়েছে। দোকানদারেরা গভীর রাত পর্যন্ত বেচা বিক্রি করে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমার সঙ্গীরাও নানা জিনিস খরিদ করেছেন কাদিয়ান থেকে। এ বৎসর জলসা গাহ্‌তে বিভিন্ন বক্তৃতাকে অনুবাদ করে হেড ফোনের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, আরবী, ইন্দোনেশী ভাষায় অনুবাদ পেশ করা হয়। বাংলা ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশীদের উপর। হেড ফোনে শ্রোতার সংখ্যাও ছিল বেশী সংখ্যক বাংলাদেশী। বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশী, পশ্চিম বঙ্গ এবং আসামের আহ্‌মদীদের জন্য পৃথক মাইক্রো ফোনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতীয় টি, ভি (দূরদর্শন) এবং রেডিও (আকাশ বাণী) তে জলসার খবর প্রদর্শিত ও প্রচার হয়। উর্দু, ইংরেজী, হিন্দী, গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় ছবি সহ জলসার সংবাদ ছাপা হয়। বাংলাদেশ থেকেও ভারতীয় টি, ভি এবং রেডিওতে অনেকেই জলসার খবর দেখতে ও শুনতে পান। নানা এলাকা থেকে সাংবাদিকরাও কাদিয়ানে এসে অবস্থান করেন। এক কথায় সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি ছিল এই কাদিয়ানের দিকে। পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের বিরুদ্ধবাদীরা তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করেছে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য! আহমদী জামাতের নেতা শেষ পর্যন্ত কাদিয়ানে ফিরে গেলেন! এত বাঁধা, এত বিপত্তি, এত চেষ্টা, এত প্রচেষ্টা করেও এই জামাতকে ব্যর্থ করা সম্ভব হল না? শেষ পর্যন্ত এই জামাত তাদের নেতাসহ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মূলকেন্দ্র কাদিয়ানে ফিরে গেলেন? মহানবী (সাঃ) আট বৎসর পর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আর আহমদী জামাতের বিশ্বনেতা তাঁর হিজরতের পর (১৯৮৪-৯১) কাদিয়ানে প্রত্যবর্তন করলেন সেই আট বৎসর পর? এমন সাদৃশ্য কেমন করে সম্ভব হল? তাহলে কি আহমদীয়াতের বিজয় অতি সন্নিকটে! বিরুদ্ধবাদীদের মনেও আজ এই প্রশ্ন বারবার উদিত হচ্ছে। আল্লাহু আকবার।

বাংলাদেশের খোদ্দামরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে জলসা গাহে এবং অন্যত্র নিষ্ঠার সঙ্গে ডিউটি করে। এদের মধ্যে দু'জন আহমদ তবশীর এবং মোহাম্মদ আহমদ হুযুরের (আইঃ) মহফিলেও ডিউটি করার সুযোগ পায়। খোদ্দামদের ডিউটি বন্টনের দায়িত্ব ছিল মেজর মাহমুদ এবং ভারতের ন্যাশনাল সদর সাহেবের জিম্মায়। যারা ডিউটি করবে তাদের লিষ্ট বাংলাদেশের খোদ্দাম প্রধান পূর্বাহ্নেই কেন্দ্রে প্রেরণ করেছিলেন। এই সফরে খোদ্দামদের নেতা ছিলেন জনাব আমীরুল হক।

যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে বাস ভাড়া করা এবং অনেকটা আমার সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব এনামুল হক ভূঞা। জনাব সাহাবুদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র মাসুম ক্লান্তিহীনভাবে কাফেলার সেবা করে অনেকের দোয়া প্রাপ্ত হয়েছে। আহমদী কাফেলায় তিনজন সদর মুরব্বী ছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন ত্রিশ জন মহিলা, অতিবৃদ্ধ, অসুস্থ, অন্ধ এবং শিশুও ছিল। যারা আমাদের কাফেলার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছিলেন তাদের হিসাব ভিন্ন। কাফেলার সকলের নাম ছেপে দিলে ভবিষ্যতের জন্য রেকর্ড হয়ে থাকত, কিন্তু স্থানাভাবে তা এখন সম্ভব হল না বলে দুঃখিত।

এবার কাদিয়ানে ভারত, পাকিস্তান এবং ইংলণ্ডের পুরাতন আহমদী বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। উড়িষ্যা, আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জামাতের বন্ধুরা সাক্ষাতের জন্য বাংলাদেশী ক্যাম্পে আসেন। শীতের মওসুমে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ফলে থাকা, খাওয়ায় যেমন সুবিধা তেমনি রোগ বালাই থেকেও অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। গরমের মৌসুমে এই জলসা হলে কষ্টের সীমা থাকত না। রৌদ্রে এত মানুষের জন্য পাখার ব্যবস্থা করা, রৌদ্রে মাঠে বসে বক্তৃতা শুনা কি সম্ভব হত? শীতের বেলায় ঘরের বা তাবুর মধ্যে ঠাসাঠাসি করেও থাকা যায়। তাই এই কাল নির্বাচনের মাঝেও একটা হিকমত এবং দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নানা দিক হতে প্রতিবন্ধকতা ও চাপ সৃষ্টির জোড়ালো চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার হুযুরকে (আইঃ) কাদিয়ান আসার অনুমতি দেন। শুধু অনুমতিই নয়, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এবং সিকিউরিটিরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমস্ত কাদিয়ান শহরটি ছিল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দ্বারা ঘেরা। দালানের ছাদে ছাদে অস্ত্রসহ পুলিশের রক্ষী দল পাহারায় রত ছিল। গাড়ীতে গাড়ীতে মেশিনগান ফিট করে টহলরত ছিল পাঞ্জাব পুলিশ বাহিনী। হুযুরের (আইঃ) ক্যাফেলার আগে পিছে থাকত সশস্ত্র পুলিশ। কাদিয়ানে প্রথম রেলগাড়ী চালু হয় ১৯২৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। দেশ বিভাগের পর যাত্রীর অভাবে এই লাইনটি বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে, হুযুরের (আইঃ) ইচ্ছানুযায়ী রেল কর্তৃপক্ষ পুনরায় ঐ তারিখেই বন্ধ লাইনটি পুনরায় চালু করেন। কর্তৃপক্ষের এই বদান্যতার

কথা হুযুর আকদাস (আইঃ) কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যে মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহ্‌র কাছেও কৃতজ্ঞ নয়।

এবার কাদিয়ান আসার পূর্বে হুযুর (আইঃ) সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকে ইস্তেখারা করতে বলেন। ইস্তেখারা করে চীন দেশীয় মোবাল্লেগ উসমান চীনী জানতে পারেন যে, হুযুরের কাফেলায় তাঁর পরিবারের বার জন সদস্য থাকবে। আর এদের জন্য কাদিয়ানের দু'টি কক্ষ খালি করাতে হবে যে কক্ষ দু'টিতে দু'টি দরবেশ পরিবার অবস্থান করছিলেন। বাস্তবে তাই হয়েছিল। খোদার সঙ্গে এহেন জীবন্ত সম্পর্ক কি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়?

খলীফাতুল মসীহের আগমনে কাদিয়ানের অমুসলিম বাসিন্দারা এতই আনন্দিত হয়েছে যে, কেউ কেউ হুযুরের কাছে অশ্রুসিক্ত হয়ে আবেদন জানায়, "আপনি আর ফিরে যাবেন না। আপনার উপস্থিতির মাঝে কাদিয়ানের কল্যাণ জড়িত।" নগর ভ্রমণকালে কেউ কেউ করজোড়ে হুযুরকে তাদের গৃহে পদার্পণ করার আহ্বান জানায়। কেউ কেউ নিজেদের ঘরে আহমদীদের স্থান করে দেয়। হুযুরকে দুধ পান করতে দেয় কেউ। দোয়া চায়। প্রেম, প্রীতি আর ভালবাসার কী অভূতপূর্ব দৃশ্য! সত্যিকার ধার্মিকদিগকে আল্লাহ অভূতপূর্ব আকর্ষণ শক্তি ও সম্মান দিয়ে থাকেন। খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাঁর ভাষণে বলেন, সেবা সেবাই। ইহার সাথে তবলীগের কাজকে সংশ্লিষ্ট করে একসাথে চালানো উচিত নয়। রিলিফের সাথে লিটারেচার বিতরণ চলবে না। রিলিফ প্রদান কালে জাতি ধর্ম বিচার ভেদ করা যাবে না। তিনি বলেন, বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের জন্য 'তাহেরাবাদ' নামে একটি পল্লী তৈরী করা হয়েছে জেনে হুযুর নির্দেশ দেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের জন্যও 'কিষণ নগর' নামে একটি পল্লী স্থাপন করা হোক। তিনি বলেন, যে ধর্ম মানবতা শিক্ষা দেয় না, সেই ধর্ম ধর্মই নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক রাশিয়ায় কমিউনিজমের মৃত্যু হয়েছে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিতে ভারসাম্য নষ্ট হবে। এতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গরীব দেশগুলি সম্বন্ধে একটু ভেবে চিন্তে কথা বলতো ও ব্যবস্থা নিত। কিন্তু এখন আমেরিকার গর্ব চরমে পৌঁছে গেছে। তার মোকাবেলায় এখন আর কেউই নেই। হুযুর (আইঃ) পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান সরকারকে যুদ্ধংদেহী মনোভাব পরিহার করে নিজ নিজ জন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দেন। তিনি হিন্দু এবং শিখ ধর্মগ্রন্থ থেকে তৌহীদ ও মানবতার বিষয়ে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করে ইসলামের মহান শিক্ষাকে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম এবং ধর্মের মূল শিক্ষা এক ও অভিন্ন। মানুষ তাতে বিকৃতি সাধন করলেও আজো গীতা এবং গ্রন্থসাহেবে সেই সব অভিন্ন বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। সভার প্রারম্ভে হুযুরের (আইঃ) রচিত একটি হিন্দী নযম সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে শুনান হয়। সভায় উপস্থিত অমুসলমান শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তা শ্রবণ করে। হুযুর (আইঃ) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে এই কাদিয়ানেই হবে প্রকৃত ইউ, এন, ও এর মূল কেন্দ্র। এখানকার জলসায় সমবেত হবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক।

ঐ সময় গগণভেদী শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হতে থাকে। সভার প্রারম্ভে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের বাণী পাঠ করে শুনান হয়। হুযূর (আইঃ) বলেন, বাটালার মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন আহমদীয়াতকে মিটিয়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিল। আজ বাটালার ছেলে-মেয়ে যুবা-বৃদ্ধ কেউই তার নাম পর্যন্ত জানে না। কেউই বলতে পারে না তার কবর কোন খানে। মৌলবী মোহাম্মদ হুসেনের বংশধররাও আজ প্রায় লুপ্ত। তার এক দৌহিত্র আহমদীয়াত কবুল করে তার নানার কর্মকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে। যেভাবে আবু জাহলের পুত্র হযরত ইকরামা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর পিতাকে আবতায় করে দিয়েছিলেন। এর চাইতে উজ্জ্বল সত্য আর কি হতে পারে? এবার জলসার শেষ দিনে ১৪ জন নেপালীসহ মোট চল্লিশ জন বয়াত গ্রহণ করেন। উল্লেখ যে, ১৮৮৯ সনে আহমদীয়াতের প্রথম বয়াতের দিনও ৪০ জন বয়াত করেছিলেন।

হুযূরের সঙ্গে বাংলাদেশী কাফেলার সাক্ষাতকালে আমি বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করি। হুযূর (আইঃ) বলেন, আমি বাংলাদেশের উপর সন্তুষ্ট। বাংলাদেশের মানুষ ভাল। এমনকি বাংলাদেশের মোল্লারাও পাকিস্তানী মোল্লাদের চাইতে উৎকৃষ্ট। তিনি বেশী বেশী তবলীগ করার উপদেশ দেন আর গণসংযোগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩০ তারিখ আমি হুযূরের (আইঃ) সঙ্গে একান্ত ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার ছেলে আহমদ তবশীরের কপালে স্নেহভরে চুম্বন করেন। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার এবং আমার পরিবারের জন্য আর কি হতে পারে? লিল্লাহিল হাম্‌দ। হুযূরের (আইঃ) কাছে আমার পৌত্র আহমদ তৌসিফের (ওয়াকফে নও) জন্য দোয়া চেয়ে বিদায় নিলাম।

ইংলণ্ড, আমেরিকার মোবাল্লেগ এবং রাবওয়া ও কাদিয়ানের বিশিষ্ট বক্তারা এই জলসায় বক্তব্য রাখেন। বিদেশীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ এম, পি, মিঃ টমকিন্স। ঘানার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এবং 'ম্যান অব গড' পুস্তকের ইংরাজ লেখক। আহমদীদের মধ্যে যেসব আগত বিদেশী বক্তৃতা করেন তারা হলেন, ব্রিটিশ আহমদী এটকিনসন, রাশিয়ার রাভেল বোখারিয়েভ (ইনি পাঁচটি ভাষায় পণ্ডিত) ইন্দোনেশীয়ার আমীর শরীফ লুবিস, নাইজেরীয়ার আমীর এবং আরো কয়েকজন

এই জলসায় তিনজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, যারা আজ এই সাহাবীদেরকে দর্শন করল, তারাও তাবেয়ীনদের মধ্যে গণ্য হল।

জনৈক বক্তা পাকিস্তানের আহমদী জামা'ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন যে, শত বাঁধা এবং অত্যাচার সত্ত্বেও সেখানে লোক দলে দলে আহমদীয়াতে দীক্ষা নিচ্ছে। মোল্লাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ইসলামী আইনের ঘোষণা দিলেও সেখানে ব্যভিচার ও ধর্ষণের ন্যায় অপকর্ম অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। ইদানিং কালে পত্র-পত্রিকায় এইসব সংবাদ অহরহ প্রচারিত হচ্ছে।

(অবশিষ্টাংশ ৫০ পাতায় দেখুন)

রাশিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা

আবদুল্লাহ শামস বিন তারিক
খাদেম, রাজশ্যাহী মজলিস

ভূমিকা

আজ রাশিয়ার যে চমক লাগানো পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তা দুই তিন বছর আগেও অনেকের কাছেই ছিল একেবারে আকাশ কুসুম কল্পনা। কিন্তু যুগে যুগে ঐশী গ্রন্থাবলী ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উক্তি বর্তমান পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে এসেছে। এই রচনা ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও উহাদের পূর্ণতার উপর আলোকপাত করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

কুরআন শরীফে সরাসরি রাশিয়ার উল্লেখ না থাকলেও যুল্ কিফল (আঃ) যুলকারনায়ন (আঃ)-এর বর্ণনা এবং 'ইয়া'জূজ মা'জূজের' কাহিনীর মধ্য দিয়ে রাশিয়া সম্বন্ধে রূপকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বস্তুতঃ কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ইঙ্গিতপূর্ণ রূপক ভঙ্গিতেই হয়ে থাকে। সূরা কাহ্ফের ৯৫ আয়াতে রয়েছে—

قالوا يذاالقرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٥

অর্থ—তাহারা বলিল, 'হে যুলকারনায়ন। নিশ্চয়ই ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এই দেশে বড় ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আমরা কি এই শর্তে তোমাকে কিছু করে দিব যেন তুমি আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করে দাও?'

এতে ইয়াজূজ-মা'জূজের ক্ষমতা ও প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর সূরা আল-আম্বিয়ার ১১৩ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দোয়া শেখানো হয়েছে—

رب احكم بالحق

অর্থ—হে আমার প্রভু! তুমি সঠিকভাবে মীমাংসা কর।

খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, "আখেরী যামানায় পৃথিবীতে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের আকারে যে শয়তানী শক্তিগুলিকে অবাধে ছেড়ে দেয়া হবে বলে অবধারিত ছিল, উহার বিরুদ্ধে আশ্রয় চেয়ে দোয়া করার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)কে ঐ আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে।"

এরূপ দোয়া, যার আদেশ স্বয়ং আল্লাহতা'লা দিয়েছেন, কখনো বিফলে যেতে পারে না। ইয়া'জূজ মা'জূজের অত্যাচারের যে একদিন সমাপ্তি হবে এই দোয়ার মধ্যে সুক্ষ্মভাবে

তাই বর্ণিত হয়েছে। এর লক্ষণ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

প্রথম আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার আলোচনা নিজে থেকে না করে আমি মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি পেশ করতে চাই—

"কুরআন শরীফে আখেরী যমানার 'যুলকার নায়নের' আবির্ভাবের যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে স্বয়ং আমিই সেই 'যুলকার নায়ন।' আর যে কওমকে রক্ষা করার জন্য যুল্‌কারনায়ন দ্বারা প্রাচীর নির্মাণ করার কথা রয়েছে, সে জাতি এই মুসলমান জাতি। তদুপরি সেই কওমকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য যে প্রাচীর নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে, তা ইসলামের স্বপক্ষে পেশকৃত যুল্‌কারনায়নের অকাট্য যুক্তিসমূহ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই যুল্‌কারনায়নকে প্রদান করা হবে। আর সেই যুগে, ইসলামকে সাহায্য করার জন্য যুল্‌কারনায়নের (অর্থাৎ মসীহ মাওউদ-আঃ-এর) সেই দোয়াসমূহ প্রাচীরের মত রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করবে যার ফলে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য আকাশ হতে ফিরিশ্‌তাগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হবেন।"

[তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন]

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইয়া'জূজ মা'জূজ (অর্থাৎ রুশ নাস্তিক্যবাদী শক্তি ও পশ্চিমা ত্রিত্ববাদী শক্তি)-এর হাত থেকে মুসলমান জাতিকে রক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা পুরণ হয়েছে; বাকিটা হচ্ছে এবং হবে।

হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীসের বহু ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আমি যে ছোট একটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করবো তাতে ইয়া'জূজ মা'জূজ কিভাবে ধ্বংস হবে সে বর্ণনা রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ—

"ইয়া'জুজ ও মা'জুজের সাথে কেউ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদের মধ্যে কলহ করে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

[মুসলিম, তিরমিযী]

এর পূর্ণতার লক্ষণ আজ স্পষ্ট। শুধুমাত্র আমেরিকার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে যে খরচ রাশিয়া করেছে তার কারণে আজ সে বলতে গেলে 'দেউলিয়া'। বিশ্বব্যাংক, আই, এম, এফ, এবং আমেরিকার কাছে রাশিয়ার আজ হাত পাততে হচ্ছে।

মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

রাশিয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলতে গেলে শুরুতেই বলতে হয় যারের পতন সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কথা। মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর কবিতার পংক্তিতে লিখেছেন—

زار بھی ہو گا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار

অর্থ—সে সময় যারের অবস্থাও শোচনীয় ও দুঃখময় হয়ে পড়বে।

[বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড]

যারের পতনের মধ্য দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যে পূর্ণ হয়েছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু মসীহ মাওউদ (আঃ) এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি লিখেছেন—

"সেই রাত্রেই (অর্থাৎ ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী) স্বপ্নে দেখি যে, রাশিয়ার যারের রাজদণ্ড যেন আমার হাতে রয়েছে; তাতে গুপ্তভাবে বন্দুকের নলও আছে।"

(তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৪৫৮)

এবং

"আমি আমার জামা'তকে রাশিয়াতে বালুকণার ন্যায় দেখছি।' (তাযকেরা, পৃঃ ৮১৩)।'

এই উদ্ধৃতিদ্বয়ে মসীহ মাওউদ (আঃ) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে রাশিয়ায় আহমদীয়াতের ভবিষ্যৎ বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি আরো বলেছেন, ইয়া'জূজ-মা'জূজের ধ্বংসের ঘটনাবলীর কেন্দ্রভূমি হবে 'মুল্‌কে শাম'; মুল্‌কে শাম বলতে সিরীয়া, লেবানন, ইস্‌রায়েল, প্যালেষ্টাইন ইত্যাদি ভূখণ্ডকে বুঝায়।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী

বাইবেলে যিহিষ্কেল অধ্যায় রাশিয়ার পতন সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অনেকের মতে এই যিহিষ্কেল ছিলেন যুল্‌কিফল (আঃ)। বর্ণিত রয়েছে:

অতএব, হে আদম সন্তান! তুমি ইয়া'জূজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কর যে, প্রভু ঈশ্বর এরূপ বলেছেন, দেখ আমি তোমার বিরুদ্ধে হে ইয়া'জূজ, মেশেক ও তুবালের প্রধান শাসক,.....আমি আঘাত করে তোমার ধনুক তোমার বাম হস্তচ্যুত করব এবং তোমার ডান হাত হতে তীরগুলো ফেলে দিব।" (যিহিষ্কেল ৩৯:১-৫)

ভবিষ্যদ্বাণীটি আরও বড়। এখানে তার অংশ উল্লেখ করা হলো। উল্লিখিত 'মেশক' ও 'তুবাল' কে অনেকে মনে করেন বর্তমান রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর মস্কো ও তিব্লিসি (Tiblisi)। যাহোক এতে ইয়া'জূজ তথা রাশিয়ার সামরিক অধঃপতন ও ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে যার প্রাথমিক নিদর্শন আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি।

খলীফাতুল মসীহ্‌গণের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) ১৯৪২ সনে বলেন,

"এ মুহূর্তে বলশেভিক আদর্শ অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে, যেহেতু দেশ কেবল মাত্র যারের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছে; কিন্তু কালের আবর্তে এর বাস্তব দুর্বলতা

সমূহের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে শুরু করবে।"

তিনি আরও বলেন,

"এরূপ হিংসাত্মক বিপ্লব, বিপর্যয়ে পতিত হতে বাধ্য।"

এবং,

"……যখন এই আন্দোলনের অধোগতি শুরু হবে, তখন এর পতন হবে আকস্মিক এবং এই আকস্মিক পতন বিশৃংখলার জন্ম দিবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতা এতই দেদীপ্যমান যে, এ সম্বন্ধে মন্তব্যের আদৌ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেননা এর আক্ষরিক পূর্ণতার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমরা সকলেই।

খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ) বলেন,

অর্থ—"যে জাতি একদিন এ ধরাধাম হতে খোদার নাম মুছে ফেল্‌তে চেয়েছিল এবং আকাশমণ্ডলী থেকেও তাড়িয়ে দেয়ার কাজে লিপ্ত ছিল অচিরেই সেই জাতি তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করবে এবং পরিশেষে আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বে ও একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী হিসেবে তাঁরই কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করবে।"

আজ তারা তাদের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তবে যেটুকু বাকি, সেজন্য আমাদের উচিত দোয়া ও প্রচেষ্টার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

রাশিয়ায় আহমদীয়াত ও ইসলাম

রাশিয়ার যারের সময়ে এবং পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক যুগে, মুসলমানদের উপর নিষ্ঠুর ও অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে। তার পরেও ইসলামের অস্তিত্ব যে টিকে আছে, তা আল্লাহ্‌র অপার কুদ্‌রত ছাড়া আর কিছুই নয়। ষ্ট্যালিন ১৯৩২ সাল ও তৎপরবর্তীকালে ২৬,০০০ মসজিদ ধ্বংস করেছিল বলে খবর পাওয়া যায়। তারপরও আজ সেখানে ইসলামের জাগরণের লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। টাইম (আন্তর্জাতিক) পত্রিকার 'কার্ল মার্ক্স মেক্‌স রুম ফর মুহাম্মদ' এবং দি ডেইলী ষ্টার (বাংলাদেশ) পত্রিকার 'মুসলিম ফ্যাক্টর এ্যালার্মড দি ক্রেমলিন হক্‌স' প্রবন্ধ সেই জাগরণেরই নিদর্শন।

রাশিয়ায় আহমদীয়াত প্রচারের সূচনা হয় ডঃ মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রাঃ) কর্তৃক লিও টলষ্টয়কে ১৯০৩ সনে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর 'ফিলসফি অব দি টিংচিস্‌ অব ইসলাম' নামক বই এবং দি রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স নামক সাময়িকীর একটি সংখ্যা প্রেরণের মাধ্যমে। ১৯০৩ সনের ৫ই জুন টলষ্টয় একটি পত্রের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আঃ) এর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৯২৪ সনের জুলাই মাসে খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশে মৌলানা যহুর হোসেন সাহেব এবং মৌলানা মোহাম্মদ আমীন খান সাহেব রাশিয়া গমন করেন। মৌলানা

যছুর হোসেন অসুস্থ হয়ে পড়াতে, মৌলানা মোহাম্মদ আমীন খান সাহেব আগে রওয়ানা হন এবং পরে মৌলানা যছুর হোসেন সাহেব ১০ই ডিসেম্বর রাশিয়ায় প্রবেশ করেন। তাঁকে বোখারা ষ্টেশনে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হলে, তিনি কয়েদীদের কাছে রুশ ভাষা শিখে তাদের মাঝেই তবলীগ শুরু করেন। সেখানেই তাসখন্দ এর প্রভাবশালী ব্যক্তি জনাব আব্দুল্লাহ খান বয়াত গ্রহণ করেন।

জেলে মৌলানা যছুর হোসেন সাহেবের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করা হয়, তার বর্ণনা খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর রচিত দি ইকোনমিক ষ্ট্রাকচার অব দি ইসলামিক সোসাইটি এবং খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ তারিখের প্রদত্ত খুৎবাতে পাওয়া যায়।

ঐ খুৎবায় হুযূর (আইঃ) মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর একটি রুইয়ার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রুইয়াটি নিম্নরূপ—

"আমি দেখলাম যে, আমাদের দেশের পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। এমন ধরণের হয়ে গেছে যে, আমাকে সেখান থেকে হিজরত করতে হচ্ছে এবং সে হিজরতকালে আমার কোলে রয়েছে আমার এক শিশু সন্তান যার নাম তাহের আহমদ এবং সে ছাড়া আর কোন বাচ্চা (সন্তান) সেখানে নেই। এই হিজরতকালীন অবস্থায় একটি নতুন দেশে আমি পৌঁছেছি এবং সেদেশে প্রবেশ করে আমি তাদেরকে (সেখানকার লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করি যে, এটি কোন্ দেশ। তারা জানায় যে, এটি রাশিয়া। আর যখন আমি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, তারা কে (তাদের কি পরিচয়)? তখন তারা মৃদু কণ্ঠে সাবধানতা অবলম্বনের ইশারা করে বল্‌ছে,' জোরে বলবেন না, আমরা আহমদী'!

এর ব্যাখ্যায় হুযূর (আইঃ) বলেন, এতে বুঝা যায় যে, তাঁর (অর্থাৎ বর্তমান) খেলাফত কালেই রাশিয়ার আহ্‌মদীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। একটি রাশিয়ান এনসাইক্লোপিড়িয়ার মাধ্যমে প্রথম রাশিয়াতে আহমদী জামা'তের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান বছরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় রাশিয়ার আহমদীরা আগমন করে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন।

উপসংহার ঃ

ইদানীং রাশিয়ান, কুর্দি প্রভৃতি ভাষায়, আহমদী জামা'ত কুরআনের তরজমা এবং অন্যান্য ইসলামী বই প্রকাশ করেছে। প্রথম আহ্‌মদী মসজিদের নির্মাণও দূরে নয়। বহু ভিনদেশী আহ্‌মদী হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে রাশিয়ান ভাষা শিখছেন। কয়েক হাজার 'ওয়াকফে নও' শিশু আজ প্রচার কার্য সম্পাদনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে শিক্ষারত আছে।

তাই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাশিয়ায় ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের বিজয়ের লক্ষণ আজ আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এর জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত থাকার তৌফীক দিন। আমীন।

তথ্যপঞ্জী

বাংলা—আহমদ, হযরত মির্যা বশীর, ইসলাম ও কমিউনিজম, সুলতানুল কলম প্রকাশনী (ঢাকা), ১৯৯০।

আহমদ, মাওলানা সৈয়দ এযাজ, সীরাতে সুলতানুল কলম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৯৯০

মোহাম্মদ, মৌলবী দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ. আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ১৯৯১।

হাসান, কে, এম, মাহমুদুল, সোভিয়েত ইউনিয়নে আহমদীয়াত, পাক্ষিক আহ্‌মদী, নব পর্যায়ে ৪৪শ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ১৯৯১।

(বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১৯৯১ সনের বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী প্রবন্ধ)

(৪৪ পাতার পর)

ইংরাজী নববর্ষ কাটল আমাদের ট্রেনের মধ্যে। ৪ তারিখ বর্ডার পার হয়ে দেশের মাটিতে পা রাখলাম। দেশের সংবাদ জানার জন্য দৈনিক ইত্তেফাক হাতে নিলাম। একটি সংবাদ এবং একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি গেল। দাবী জানান হয়েছে, আন্তর্জাতিক আহমদী মুসলিমদেরকে বাংলাদেশে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য। মনে প্রশ্ন জাগল, সরকার ঘোষণা না করা পর্যন্ত কি কেউ অমুসলমান নয়? সরকারী ঘোষণার বলে কি কেউ মুসলমান হয়? যদি না হয়, তাহলে সরকারী ঘোষণার ফলে কেউ অমুসলমান হবে কোন্‌ যুক্তির বলে? একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি দেশ কি করে আইন দ্বারা আবদ্ধ করবে? পাকিস্তান আইন করে কি আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করতে পেরেছে? কাদিয়ানে নিজ চক্ষে হাজার হাজার প্রাণবন্ত পাকিস্তানী আহমদীকে দেখে এলাম। ৫০টি দেশের আনুমানিক ২৫ হাজার আহমদী, যারা কাদিয়ানের জলসায় এসেছিলেন তাদের উপর কোন একটি দেশের সরকারের ঘোষণা বা ফতওয়ার মূল্য কতটুকু? এই সঙ্গে মানিক মিঞার ইত্তেফাকের ভূমিকা দেখে স্মরণ করলাম সেই পুরাতন দিনের কথা! এই পত্রিকায় লেখা হয়েছিল; "সর্বদলের, সর্বদেশের, সর্বজনের প্রাকৃতিক দীনুল কাইয়েম ইসলাম বহুধা বিভক্ত মানব গোষ্ঠীর মিলন ক্ষেত্র।... ... ...যারা জন্ম নিল প্রেম প্রীতি ও ইনসাফের দ্বারা বিশ্বের সকল কাফিরকে মোমিন করার জন্য তারাই ফতওয়ার তরবারী দ্বারা নিজেকে ছাড়া সকল মোমিনকে কেটে ছেটে করে দিল কাফের" (১৭ই চৈত্র, ১৩৬৪)। আজ সেই মানিক মিঞাও নেই, সেই ইত্তেফাকও নেই। ইত্তেফাকের উপর আজ দুষ্ট তারকার ছায়া।

"মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও সোনার পিতলে কলস

ধর্ম না মানলে তবেই ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন হয়। আর যদি ধর্ম মানা এর ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা হয়, তাহলে ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কোনই প্রয়োজন হয় না। অন্ততঃপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে তো এটা গভীরভাবে সত্য। আর এটাও চরম সত্য যে, ইসলাম বিপন্ন হবার ধর্ম নয় অথবা "ইসলাম" কখনো বিপন্ন হয়নি। ইসলাম বিপন্ন এই আর্তচিৎকারটি তোলে একটি বিশেষ মতলববাজ মহল। আমরা সবাই জানি কিন্তু মনে রাখিনা যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত ধর্ম, তিনি স্বয়ং সে ধর্মের রক্ষক। তবে মুসলমান নামে জনসমষ্টিদের নিয়ে কথা। কিন্তু তার আগে বলতে চাই যে, ইসলাম ধর্ম, উদ্‌বগ্নী বা কর্পূরের মত উবে যাওয়ার মত কিছু পদার্থ নয়—এ বিশ্বাস যায় আছে তিনি সব কিছুর আগে নিজের দিকে তাকাবেন নিজের আখলাক, নিজের আকায়িদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হবেন। আর ওসবের বালাই যার বা যাদের নেই তাদের কাছেই ইসলাম বিপন্ন হয়। কথাটা রূঢ় হলেও সত্য। রিয়াকারী অথবা নাম সর্বস্ব মুসলমানদের মধ্যে ইসলামই বা কোথায় আর তাঁরা সত্যিই ইসলামে বিশ্বাস রাখেন এমন কোন প্রমাণ বাস্তব জীবনে কি রাখ্‌ছেন? কই দৃষ্টিগোচর তো হয় না। দৃষ্টিগোচর হয় না বলেই বিরাট সাইন বোর্ডের প্রয়োজন হয়।

যে কথা বলা হয়েছে একটু আগে—ইসলাম বিপন্ন হয় না, বিপন্ন হয় মুসলমানরা। ব্যাকরণ অনুযায়ী যারা ইসলামে বিশ্বাসী, ঈমানটা ইসলামের ওপরে। তারাই মুসলমান। ঠিক কথা। কিন্তু তবু ইসলাম এবং মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বেশ প্রকাণ্ড ফাঁক সৃষ্টি হয়ে গেছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন যতদিন মুসলমানরা নাহি আনিলমুনকার আর আমরবিল মারুফের ওপর দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে, অন্যায়ের প্রতিরোধে যতদিন তারা লা পরোয়া, সৎকর্মে যতদিন পর্যন্ত তারা নিবেদিত প্রাণ থাকবে ততদিন পর্যন্ত তারা অজেয় থাকবে, তারা থাকবে সবার নেতৃত্বে। আর যখন থেকে তারা ঐ দুটি নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্ম সর্বস্ব হয়ে পড়বে, তখন থেকেই আসবে তাদের পতনের যুগ। আল কুরআনের এই মহাবাণী রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) শেষ উপদেশ কিংবা নির্দেশ। মুসলমানরা যদি ঐ মহাবাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, যদি তারা অন্যায়, অবিচার, পীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন কি করে তারা আশা করে যে, সবার পদাঘাত তারা খাবেনা। বরং মোনাফেক মুসলমানদের জন্য ঐ পুরস্কার বরাদ্দ রয়েছে, এ কথাও আল কুরআনে এবং মহানবী (দঃ) স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। কাজেই বিপদাপন্ন যদি কেউ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা ঐ মুসলমান জনসাধারণ এবং সে বিপদ তারা সেধে ডেকে এনেছে। যদি প্রশ্ন করা হয়, দুনিয়ার, আচ্ছা দুনিয়া থাক, আমাদের দেশের শতকরা কজন মানুষ শেষ বিচারের দিনের বিচার এবং শাস্তির কথায় বিশ্বাস করে অথচ মুসলমান তো দেশে বিপুল সংখ্যা গুরু। চুরি, জোচ্চুরী, ব্যাভিচার, হারামখোরী

বা অনুসারী কি বলবেন? আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু এই সব তথাকথিত ব্যক্তিরা কি বিশ্বাস করেন রাব্বুল আলামিনের দৃষ্টিকে ফাকি দেওয়া যাবে না কোন মতেই। প্রতিদিন নামাজের সময় তারা তো আল কুরআনের ঐ পবিত্র বাক্য পাঠ করেন কেয়ামতের পর শেষ বিচারের দিনে, সবার সামনে তাদের সকল কর্ম, তাদের মনোভাব, উপস্থাপন করা হবে কিছুই বাদ যাবে না, যদি বিন্দুমাত্র সৎকর্ম থাকে তাহলে তাও উপস্থাপিত হবে, যদি বিন্দুমাত্র খারাপ কর্ম থাকে, তাও উপস্থাপিত হবে। এই হুঁশিয়ারী বাণীর প্রতি যার বিন্দুমাত্র ভয় বা আস্থা আছে তিনিই তো মুসলমান। তাঁর কাছেই তো জিন্দা ইসলাম দেদীপ্যমান। রাজনৈতিক ফায়দা লুঠবার জন্যে যারা ইসলামের ধ্বনী দেয় তাদের কাছে আর যাই হোক ইসলাম নেই। তাদের কাছে একটা "ডামী" বা খোলস।

নাহি আনিল মুনকার অন্যায়ের প্রতিরোধকারী যিনি—তিনি দুটি সার সত্যকে জীবন দিয়ে বিশ্বাস করেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন আছেন, আর ব্যক্তি মানুষ যখন অন্যায়ের প্রতিবাদী হয় নিষ্কামভাবে তখন আল্লাহই তাঁর সহায় হন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের জন্যে আল্লাহ্ যা নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন, তার ব্যাত্যয় হবে না কিছুতেই। তাহলে ভয়টা কিসের জয় পরাজয়ের শংসয়টাই বা কিসের? অন্যদিকে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি, সৎকর্ম করেনি বা সে ব্যাপারে উৎসাহ, দেয়নি সেই সব মুসলমান নির্ঘাতীত অবমানিত পদদলিত হবেই। স্পষ্ট এরশাদ হয়েছে 'এর আগে বহু নবীর উম্মতেরও ঐ একই দশা হয়েছে। মুসলমানরাও তা থেকে বাদ যাবে না। যদি তারা, অন্যায়চারী, ব্যাভিচারী পীড়ক, মুনাফেক, গোমরাহ হয় যদি তা আত্মকেন্দ্রিক হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে মুসলিম জাতীয়তাবাদ।' এ শ্লোগান তুলে আর যা হোক ইসলামকে উজ্জলও করা যাবে না মুসলমানদের কোন উপকারও করা যাবে না। মনে রাখা দরকার জাতীয়তাবাদ আর "ইসলাম" দুটো সম্পূর্ণ আলাহিদা ব্যাপার। কাজেই ইসলামী জাতীয়তাবাদে নাম দিয়ে যে জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয় তা' সম্পূর্ণই ভাওতাবাজী এবং এই ভাওতাটি দেওয়া হয় কিছু সংখ্যক উচু তলার মানুষের এবং তাদের অপদার্থ সহযোগিদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ, শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার পীড়ন কায়েম রাখার জন্য। আর আজকাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এই ভ্রান্ত ধারণাটির সবচেয়ে বড়ো প্রচারক। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলছি ধর্ম আর জাতি আলাদা জিনিস, অন্ততঃপক্ষে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ তো নির্ভেজাল আলাদা ব্যাপার। সুবিধাবাদীরা এই ধুয়া তুলেই তো আমাদের ওপর নির্যাতনের রোলার চালিয়েছে। পাকিস্তানে এর নজীর কি আমরা দেখছি না?"

(দৈনিক উত্তর বার্তা,—বগুড়া-এর২৮শে পৌষ, ১৩৯৮ সংখ্যার সৌজন্যে)

ইসলামে সামাজিক জীবন

সরফারাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মহানবী হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, পীড়িতকে দেখা শোনা কর, অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ বন্দীকে মুক্ত কর; যেকোন অত্যাচারী ব্যক্তির সাহায্য করবে, সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান। ঈমানের তিনটি মূল আছে, এর একটি হলো, যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই, তাকে পীড়ন না করা; দ্বিতীয়তঃ একটি খুঁত পাইলেই কাহাকেও কাফের মনে না করা; এবং তৃতীয়টি হলো একটি মাত্র অপরাধে কাহাকেও পরিত্যাগ না করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! 'ইসলাম কি'? উত্তরে হুযুর (সাঃ) বললেন, 'সত্য ভাষণ ও পরোপকার।'

"খাটি মুসলমান সে-ই যার রসনা ও হস্ত থেকে মানব জাতি নিরাপদ।" দয়া ঈমানের একটি লক্ষণ, ইহা যাহার মধ্যে নেই তার ঈমানও নেই।" "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন মুসলমান নয়, যে নিজে পেট ভরিয়া খায় এবং তার প্রতিবেশী উপবাসে রাত কাটায়।" "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন মুসলমান নয়, যার হস্ত এবং যবান থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" "যে কেহ সৃষ্ট জীবের প্রতি সদয়, আল্লাহ্ তার প্রতি সদয়, অতএব, সকল মানুষের প্রতি দয়ালু হও।"

ইসলামে এবাদত দুইভাগে বিভক্ত। হুকুকুল্লাহ, এবং হুকুকুল এবাদ। হুকুকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য। কলেমা, নামায, রোযা ইত্যাদি হুকুকুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহতা'লা রাহমানুর রহীম। তিনি অতি দয়ালু। কোন লোক যদি হুকুকুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত কর্তব্যসমূহ পালন না করে এবং পরিশেষে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দয়া গুণে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু কোন মানুষ যদি অন্য কোন মানুষ কর্তৃক নিগৃহীত হয়, শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হয়, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতা'লা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিগৃহীত ব্যক্তি ক্ষমা করে। হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল এবাদ সম্পর্কে একটু তলিয়ে দেখলে, বুঝা যায় যে, মানুষের কল্যাণ করাই মানুষের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষের সেবার জন্য মানুষের সুখ শান্তির নিমিত্ত, কথা এবং কাজে একে অন্যকে সাহায্য করার মধ্যে মানবজাতির মহা কল্যাণ নিহিত। মানুষের মঙ্গলের জন্য, মানুষের সুখ শান্তির জন্যই ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে।

এককালে ইসলাম ধর্মের একতা, ভ্রাতৃত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্য, মানবতাবোধ, এবং সামাজিক ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রদর্শক—দীনে ইসলাম। একজন

প্রকৃত মুসলমান তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে খেতে পারে না। সমাজে দারিদ্রকে অর্থ-নৈতিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধনীর প্রতি আরোপ করেছে যাকাত, সদকা, দান ও খয়রাত ইত্যাদি। বর্তমানকালে মানুষ যদি ইসলামের বিধানানুযায়ী ধনীদের প্রতি আরোপিত দারিদ্রের হক আদায় করে চলতো, তবে সমাজের মধ্যে এত মানুষ দারিদ্রতার যাতাকলে নিষ্পেষিত হতো না। ইসলাম ধর্মের ন্যায় এমন নিখুঁত সুন্দর সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা কোন কালে কোন সময় পৃথিবীতে ছিল না। ইসলামে ধনী-দরিদ্র সাদা-কালো, ইত্যাদি বর্ণ বৈষম্যের কোন স্থান নেই। মহত্বের গুণে একজন দরিদ্র দাস জাতির নেতা হতে পারে। ইতিহাসে ইহার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। পাক কালামে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন :— "আল্লাহ্‌র সমীপে তিনিই সর্বাপেক্ষা সম্মানী ব্যক্তি যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্ম-ভীরু।" জাগতিক বিষয়ে ইসলাম যেমন সমান অধিকার দিয়েছে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও সকলের জন্য ন্যায়দণ্ড স্থাপন করেছে। ইসলামে কোন প্রকার শ্রেণী বা বর্ণ বিভাগ নেই। সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। কোন জাতি, দল বা ব্যক্তি কেউ কারো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। সকলের জন্য পূর্ণ সমতা রয়েছে। ইসলামে জাতিগত বা দেশগত কোন পার্থক্য নেই, সকল মানুষই সমান। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সাথী সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাদের মধ্য হতে অনেক নর-নারী সৃষ্টি করে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।" মানুষ যে একই আদমের সন্তান উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা তা বর্ণনা করতঃ মানুষে মানুষে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআন পাকে অন্যত্র বলেছেন। "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।" সংসারে নারী এবং পুরুষ মিলেই সমাজ জীবন। নারী ব্যতীত পুরুষের জীবন অসার, এবং পুরুষ ব্যতীত নারীর জীবন মরুভূমি তুল্য। নারী ও পুরুষ একের অভাবে জীবনে আসে অপূর্ণতা, দুইয়ে মিলে হয় পূর্ণতা অর্থাৎ নারী আর পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। নারীকে বাদ দিয়ে সমাজ জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চলতে পারে না। প্রাক্‌ ইসলামিক যুগে নারীগণ ছিল পুরুষের ভোগ বিলাসের সামগ্রী। তাদের প্রতি যথেচ্ছাচার করা হতো। সমাজে তাদের কোনই স্থান ছিল না। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে—"এক ব্যক্তি হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। কন্যাটি আমাকে খুবই ভাল-বাসতো। আমি যখনই তাকে ডাকতাম, সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম এবং আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একটি কুপ দেখে তাকে ধাক্কা দিয়ে কুপের ভিতর ফেলে দিলাম। কন্যাটি কুপের ভিতরে তলিয়ে গেল। তার শেষ ফরিয়াদ যা আমার কানে আসলো, তা ছিল, আব্বা, হায় আব্বা।" হযরত

(অবশিষ্টাংশ ৫৭ পাতায় দেখুন)

পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আদরের ছোট ছোট ভাই ও বোনের, আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি খোদার ফযলে তোমরা সকলে কুশলেই আছো। পরীক্ষার শেষে নিশ্চয় তোমরা মামা বাড়ী নানা বাড়ী বেড়াতে গিয়ে আনন্দে দিনগুলো কাটিয়েছ। নানা প্রকার শীতের পিঠে খেয়েছ অনেক মজা করে, তাই না। আমাদের কিন্তু কেবল দুনিয়ার মজা পেলেই চলবে না, আমরা আহ্‌মদী সন্তান, আমাদেরকে একদিন সারা দুনিয়ার শিক্ষা গুরু হতে হবে। সারা দুনিয়াকে দেখাতে হবে সত্যিকারের পথ। মিথ্যা আর কলুষতার অবক্ষয়ে জর্জরিত সমাজকে দিতে হবে সঠিক পথের দিশা, তাই আমাদের সামনে রয়েছে বিরাট কর্মক্ষেত্র। যে কর্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আজ আমাদেরকে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। শ' শ' প্রফেসার ডঃ আবদুস সালাম ও জাফরুল্লাহ খান আমাদের মধ্যে হতে হবে। তাই প্রতিটি মুহূর্তকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। যদি আমরা সময় মত কাজ না করি তাহলে শীতের শেষে ফড়ি-এর মত আফসোস করতে করতে আমাদের জীবন কাটাতে হবে।

নতুন ক্লাশে নতুন বই-পুস্তক নিয়ে পুরোদমে পড়াশুনার প্রস্তুতি নিচ্ছ নিশ্চয়ই। কথায় বলে, শুরু যার ভাল তার অর্ধেক কাজ সুসম্পন্ন। সুতরাং বছরের প্রথম থেকেই যদি তোমরা ভালভাবে পড়াশুনা শুরু করে দাও তাহলে নিঃসন্দেহে ক্লাসে সবার চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে আর বছরের শেষে বয়ে নিয়ে আসবে মনোমত ফলাফল। সর্বদা পড়াশুনার সাথে সাথে দোয়ার কথা যেন আমরা ভুলে না যাই, কেননা আমাদের যা কিছু পাওয়ার সবই করুণার আধার মহান আল্লাহ্‌তা'লার নিকট থেকে পেতে হবে। তাই চেষ্টার সাথে দোয়ার কথা সদা আমাদের মনে জাগ্রত থাকতে হবে, তবেই আমরা অসাধ্য সাধনে সক্ষম হবো। সাথে সাথে পিতা-মাতা জামা'ত তথা দেশের জন্যে সম্মান কুড়োতে সক্ষম হবো। আল্লাহতা'লা যেন তাই করেন।

পরিশেষে তোমাদের নিকট মসজিদের আদাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি :

ইসলামী শিষ্টাচার

মসজিদের আদাব

(১) মসজিদ অর্থ সেজদার স্থান, একমাত্র এক-অদ্বিতীয় আল্লাহতা'লাকে সেজদার নিমিত্ত এ মসজিদ ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আল্লাহতা'লার তৌহীদ বা একত্ববাদকে দুনিয়াতে

প্রতিষ্ঠা করার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ কর্মও মসজিদে বসে করার রীতি আমাদের প্রিয় নবীজী (সাঃ)-এর আমল থেকে চলে আসছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় যখন ছিল না তখন এ মসজিদই বিদ্যাপীঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

(২) মুসলমান ছাড়া অন্য কোন ধর্মের লোক যদি মসজিদে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্-তা'লার এবাদত করতে চায় তাহলে তাথেকে তাকে বাধা দেয়া যাবে না, যেমন কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১১৫ আয়াতে আল্লাহতা'লা বলেছেন "এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়?" আল্লাহতা'লার এ আদেশ হুযুর (সাঃ) নাযরানের খৃষ্টানদেরকে মদীনার মসজিদে এবাদত করার অনুমতি দিয়ে নিজে পালন করে দেখিয়ে গেছেন।

(৩) দুনিয়ার সর্ব প্রথম মসজিদ মক্কার কা'বা ঘর। হযরত আদম (আঃ)-এর সময় ইহা নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়। হুযুর (সাঃ) বলেছেন, আমি আখেরুল আম্বীয়া (নবীদের শ্রেষ্ঠ) এবং আমার এই মসজিদ (অর্থাৎ মদীনার মসজিদ) আখেরুল মসজিদ (মসজিদের সেরা) (মুসলিম)। হুযুর (সাঃ)-এর পর দুনিয়াতে যত মসজিদ হয়েছে তা ঐ মসজিদের অনুরূপ এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 'আখের' অর্থ শেষ করলে এ হাদীসের মর্মই যে বৃথা হয়ে যাবে। আখেরী মসজিদের পর কি দুনিয়াতে মসজিদ হয় নি? আখেরী মোনাজাতের পর কি আর মোনাজাত হয় না? তবে আখেরী নবীর গোলাম হয়ে তাঁর অনুসরণ অনুকরণে 'উম্মতি নবী' আসলে বিপত্তি থাকবে কেন?

(৪) সারা দুনিয়াকে যদিও হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর জন্যে মসজিদ করা হয়েছে তবুও স্বল্প পরিসরে মসজিদ রূপ এবাদত গাহ দুনিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। এখানে যারা প্রবেশ করবে তাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য যেন কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়।

(৫) পাক সাফ অবস্থায় এখানে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ কালে সালাম দিয়ে নিম্নের দোয়া পাঠ করে এখানে প্রবেশ করতে হয়ঃ

"আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতেকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার করুণার দ্বারসমূহ আমার জন্যে খুলে দাও।

(৬) কাঁচা পিয়াজ, রশুন খেয়ে বা বিড়ি সিগারেটের মত বদ নেশা করে দুর্গন্ধ মুখে মসজিদে যাওয়া নিষেধ বরং আতর বা অন্য কোন সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যাওয়া ভাল।

(৭) অভ্যন্তরীণভাবে তাক্‌ওয়ার খোদা-ভীরুতা পোষাক-পরিচ্ছদে এবং বাহ্যিকভাবে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে মসজিদে যেতে হয়।

(৮) মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকায়াত নফল নামায পড়া উত্তম।

(৯) মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বললে, হট্টগোল করলে বা বেহুদা কথাবার্তা ও

হাসিঠাট্টা করলে মসজিদের আদব নষ্ট হয়।

(১০) মসজিদে প্রবেশ করে সামনের যে কাতারেই স্থান পাওয়া যায় সেখানে বসে যাওয়া উচিত।

(১১) মসজিদ যিক্‌রে এলাহী বা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করার স্থান। মাছ পানিতে থাকলে যেমন জীবন্ত থাকে তেমিন মসজিদে থাকাকালীন সময়ে আল্লাহ্‌র যিকরের মাধ্যমে মোমেনের রূহ জীবন্ত হয়ে উঠে। বাজাম'াত নামাযের অপেক্ষায় যদি কেউ মসজিদে বসে আল্লাহ্‌-তা'লার যিক্‌র করতে থাকেন তিনি যেন নামাযের মধ্যেই শামেল রয়েছেন বলে ধরা হয়।

(১২) সর্বদা মসজিদের পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। মসজিদকে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন করা নেহায়েত অন্যায় বরং এখানে কোন ময়লা দেখলে তা পরিষ্কার করে ফেলার জন্যে আগ্রাহান্বিত হওয়া দরকার।

(১৩) মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার সময়ে সালাম দিয়ে নিম্নের দোয়া পাঠ করে বের হতে হয় :

"আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা ফায্‌লিকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! তোমার আশিসের দ্বারসমূহ আমার জন্যে খুলে দাও।

(৫৪ পাতার পর)

রসূল করীম (সাঃ) এই নির্মম ঘটনাটি শুনে কেঁদে উঠলেন। তাঁর দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এমন সময় একজন বলে উঠলো, তুমি কেমন ব্যক্তি যে, এই ঘটনাটি শুনিয়ে তুমি রসূলে পাক (সাঃ)-এর মনে আঘাত দিলে, তাঁকে দুঃখিত এবং ব্যথিত করলে? তখন হযরত রসূল করীম (সাঃ) বললেন, "এই লোকটিকে বাধা দিও না, যে বিষয়ে তার তীব্র অনুভূতি রয়েছে, সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে দাও।" অতঃপর তিনি নিজেই সেই ব্যক্তিকে ঘটনাটি আবার বলতে বললেন। লোকটি পুনরায় তা বিবৃত করলো। হুযুর (সাঃ) তা শুনে এত কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, জাহেলিয়াতের সময়ে যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্‌তা'লা তা মাফ করে দিবেন। এখন নতুনভাবে নিজের জীবন শুরু কর।" এই ছিল তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র। ইসলাম সেই অবহেলিত, লাঞ্ছিত নারী জাতিকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পুরুষের সাথে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সমাজ জীবনে নারীগণ পুরুষের সেবাদাসী বা ভোগ বিলাসের সামগ্রী নয়, একে অন্যের সহযোগী, বন্ধু।

আমাদের জাতীয় সালানা জলসা

আগামী ৭, ৮, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে (৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১) আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৬৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌। এই জলসায় খাতামান্নবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন, মহানবী (সাঃ)-এর গোলাম ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জীবনাদর্শ এবং বর্তমান কালের সমস্যাবলী ও তার ঐশী সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত ওলামা ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ সুচিন্তিত বক্তব্য রাখবেন।

এই মহতী জলসায় যোগদানের জন্য সুধীবৃন্দকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

খাকসার
ভিজির আলী
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি '৯২
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহাউদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় পবিত্র বাণী

জলসার গুরুত্ব এবং যোগদানের তাকিদ ঃ

"বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায়, পথ খরচের সামর্থ্য রাখেন এইরূপ সকল ব্যক্তিরই যোগদান করা আবশ্যকীয়। তাঁহারা যেন প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের (সন্তুষ্টির লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রূক্ষেপ না করেন। খোদাতা'লা মুখলেস (খাঁটি ও সরল) ব্যক্তিগণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট বৃথা যায় না।

পুনঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবে না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্‌ তা'লা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন, এবং ইহার জন্য জাতিবর্গকে প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা অচিরেই আসিয়া যোগদান করিবে, কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কার্য যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।"

জলসার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) "এই জলসার একটি মহৎ উদ্দেশ্য ইহাও যে, প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন প্রত্যক্ষভাবে দীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান এবং তাহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফাতে সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।"

(২) "একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই (মহতী) জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে।"

জলসায় যোগদানকারীগণের জন্য বিশেষ দোয়া

"অবশেষে আমি দোয়া করিতেছি, আল্লাহ্‌ তা'লা যেন এই লিল্লাহী (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন, সকল বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগজনক অবস্থা তাহাদিগের জন্য সহজ করিয়া দেন, তাহাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করেন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিস্কৃতি দান করেন, তাহাদের সকল শুভ কামনা পূরণের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করেন ও পরকালে তাহাদিগকে সেই সকল বান্দার সহিত উত্থিত করেন যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বিরাজ করে এবং তাহাদের সফরকালীন অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার আধার! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এই দোয়াসমূহ কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় দান কর, কেননা সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তুমিই। আমীন পুনঃ আমীন" (ইশ্‌তেহার, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ইং)

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

সালানা জলসা চলাকালীন দিনগুলোতে নিম্নলিখিত মূল্যবান কথাগুলোর প্রতি নিজে দৃষ্টি দিন এবং অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন

মিষ্টি কথা যাদুর কাজ করে :

০ আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের প্রতি সদয় হন যারা অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। সবার সাথে সদয় ব্যবহার করুন এবং পরস্পর প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে এবং হাসিমুখে মিলিত হউন। ০ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সব সময় নম্র ও প্রীতিপূর্ণভাবে কথা বলতেন। তাঁর অনুসারী ও অনুগামী হিসেবে আমাদেরকে অন্যভাবে কথা বলা উচিত নয়। ০ কাউকে মনে আঘাত দিবেন না। আল্লাহ্‌র ভালবাসা কার মনে বাসা বেঁধেছে, আপনি জানেন না। ০ মিষ্টি কথা যাদুর কাজ করে। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন। ০ যুক্তি তো সর্বক্ষেত্রে দেখানো যায়, কিন্তু সে কতই না উত্তম যার মাঝে হিতাকাংখা ও নম্রতা রয়েছে। ০ জলসার দিনগুলোতে নিজেকে বার বার স্মরণ করাবেন : "আমি একজন আহ্‌মদী—একজন সত্যিকার মুসলমান। আমার মাধ্যমে যা বিকশিত হওয়া উচিত, তা হচ্ছে দোয়া, ভালবাসা, আনন্দ, পরোপকার, নম্রতা আর মানব সেবা।"

আমাদের জামা'তের কিছু ঐতিহ্য রয়েছে যেগুলো মেনে চলা আপনার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য :

০ জলসা কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী পুরোপুরী মেনে চলুন। ০ প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃংখলা বজায় রাখুন। ০ নামায ও বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে সকল প্রকার কেনাকাটা থেকে বিরত

থাকুন। ০ ধুমপান বর্জন করুন। ধুমপানে শুধু নিজেরই নয়, অন্যের অনেক ক্ষতি হয়। মুমেন জেনে শুনে কারো কোন ক্ষতি করে না। ০ উত্তম আচরণ প্রদর্শন করুন। সর্ব-প্রকার অসুন্দর ও মন্দ কাজের প্রতিকার করুন ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও দোয়ার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ্‌-র ইবাদতের উদ্দেশ্যে ঃ

০ আযান শুনামাত্র হাতের কাজ ছেড়ে দিন। নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, ওযু করুন এবং মসজিদের দিকে রওয়ানা হউন। মাথায় টুপি পরিধান করুন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করুন। মসজিদে যথাসম্ভব সামনের সারিতে যেখানে জায়গা পান বসে পড়ুন এবং নিজেকে দরূদ এবং এস্তেগফার পাঠে নিয়োজিত রাখুন। নিজে শিখুন ও অপর-কেও বলুন—নামায জান্নাতের চাবিকাঠি, নামায ইসলামের একটি স্তম্ভ, নামায ইবাদতের সারাংশ, নামায আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উপায় বিশেষ। জলসার দিনগুলিতে সমস্ত নামায বা-জামা'ত আদায় করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আপনি যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ডাকে এ পবিত্র সমাবেশে যোগ দিয়াছেন সুতরাং আপনার কোন আচরণ যেন সে উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন।

সংশোধনী

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	এখন পাঠ করতে হবে
১৩শ সংখ্যা (১৫ই জানুয়ারী '৯২)	২	৩৪	আবরণের	অবতরণের
,,	২৩	২৭	খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা	পুনঃ খেলাফত লাভে

পাক্ষিক আহ্‌মদীর চাঁদা বাড়লো

কাগজ, ছাপা খরচ, ডাক খরচ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকার বার্ষিক সডাক চাঁদা ১-৭-৯১ তারিখ থেকে নিম্নলিখিত হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণের সহযোগিতা কামনা করছি। বর্তমানবছরে যারা পূর্বোক্ত হারে চাঁদা দিয়েছেন তাদেরকে বাড়তি টাকা আদায় করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে—৭২টাকা
তবলীগের কাজে—৪০টাকা
ভারতে—২পাউণ্ড
অন্যান্য দেশে—১৫ পাউণ্ড

পাক্ষিক আহ্‌মদী ব্যবস্থাপনা

স্বদেশ চিন্তা

কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন

আহমদ শরীফ

"শহরের ফুটপাথে যখন হাঁটি, তখন অন্ধ-খঞ্জ-পঙ্গু ভিখিরীদের করুণ আকুল আবেদন অনেক সময় আমাদের ব্যথিত করে তোলে, অথচ অসামর্থ্যের দরুণ তাদের আবেদন নীরবে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের নিজেদের বাহ্যত নিষ্ঠুর অমানুষের পর্যায়ে ফেলে।

আবার শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারের গ্লানিমা করুণ মুখও আমাদের বিচলিত করে, তারাও পথে পথে অবিরল। ওদের সঙ্গে কথা হয় না, কিন্তু দেখলেই তাদের দুর্দশা ও সমস্যা অনুভব করি। বিশেষ করে বাজারের কোণে কোণে ও রাস্তার মোড়ে কাজের আহ্বানের জন্যে প্রতীক্ষমান মজুর-শ্রমিকদের চোখ-মুখে যে উৎকণ্ঠা প্রকট হয়ে ওঠে, তা হৃদয়বান সংবেদনশীল মানুষ মাত্রকেই ব্যথিত করে। আর দরিদ্র অথচ ভিক্ষায় অনীহ শিশু বালক-বালিকা ফুল-মালা হতে যখন করুণ কণ্ঠে ও মিনতিভরা চোখ তুলে সাধে কাউকে নেয়ার জন্যে, প্রায়ই তাদেরও আমরা পথচারীরা কিংবা গাড়িওয়ালারা অমানবিক অসৌজন্যে মুখ ফিরিয়ে থাকি। বৃথা ও ব্যর্থ হয় তাদেরও করুণ কান্না প্রায় আবেদন। আর বাজারের মিনতি টোকাইদের 'সাব মিনতি লাগবো' কথার মধ্যে ফুটে ওঠে তার অনিশ্চিত রোজগারের ও অসহায়ত্বের কারুণ্য।

আর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় কুলি-মজুর-মিল শ্রমিক, চাষী-ঠেলা-রিকশা চালকদের রোদ-বৃষ্টি শৈত্যক্লিষ্ট হয়ে লাগাতার কাজ করার দৃশ্য তো সার্বক্ষণিক বলেই আমাদের চোখসহা ও মনসহা হয়ে গেছে বলেই আমাদের মোটেও ভাবায় না, নইলে শ্রমদান গ্রহণ পদ্ধতিতে যে আদিমতার ও বর্বরতার সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর রয়েছে তা দেখে ও বুঝে আমরা ব্যথিত ও লজ্জিত হতাম, আর প্রতিকারে ও পরিবর্তনে সামাজিক রাষ্ট্রিকভাবে প্রয়াসী হতাম।

অন্যদিকে আমাদের অর্থ সম্পদের নিয়ন্ত্রক এবং ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগকারী ব্যবসাদার, কারখানাদার, ঠিকেদার, আমলা-মন্ত্রী, মেম্বর, ভেজালদার, আড়দার-মৌজুতদার, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, দালালি-কমিশন-বখশিস ও ঘুষখোর, ধূর্ত-দুষ্ট-দুর্জন, দুরন্ত-দুষ্কৃতেরা শোষণে-পীড়নে-প্রতারণায় জনজীবনে রাখছে উপদ্রুত, বিপন্ন তাই শঙ্কা-ত্রাশ তাদের দিবা-রাত্রির সঙ্গী।

ভিখিরী থেকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী আর প্রান্তিক অসচ্ছল চাষী অবধি হাজারে নয়শ' নিরানব্বইজন মানুষ সপরিবার অপুষ্টির, অর্ধাহারে অচিকিৎসার শিকার হয়ে অকালে অসময়ে অপমৃত্যু বরণ করে। সবাই জানি, অজ্ঞতার ও অচিকিৎসার দরুন আজও গাঁয়ে গঞ্জে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু অবিরল।

আমাদের বাংলাদেশের মতো দরিদ্রতা-অনক্ষরতা আকীর্ণ দেশে এসবই আমাদের ইহ-জাগতিক জীবনের নিত্য সমস্যা ও সংকট হয়ে বিরাজ করছে। এগুলোর প্রতিকার ও সমাধান পন্থা সন্ধানই আমাদের শিক্ষিত স্বচ্ছন্দ মধ্য ও উচ্চবিত্ত মানুষের ভাবনা-চিন্তার মননের ও প্রয়াসের বিষয় হওয়া ছিল বাঞ্ছিত, আবশ্যিক ও জরুরী দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু এ বিষয় সাধারণভাবে আমরা প্রায় মধ্য ও উচ্চবিত্তের সব মানুষকেই উদাসীন দেখি বরং ওদের দুর্বলতার ও দুদর্শার আর অজ্ঞতার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মধ্য উচ্চবিত্তের লোকেরা অর্থ সম্পদ শোষণে লুণ্ঠনে আত্মসাৎ করতেই সদাব্যস্ত দেখতে পাই। এরাই গণ দুঃখ-দুর্দশার কারণ তথা স্রষ্টা।

এ লুটেরা শোষক শ্রেণী চিরকালই অকাজের কাজী! তার একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে একশ্রেণীর স্বার্থবাজ-মতলববাজ ও জাঁহাবাজ লোকের নেতৃত্বে গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী প্রবর্তিত আহ্‌মদ কাদিয়ানী প্রবর্তিত আহ্‌মদীয়া বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবীর আন্দোলন। এরা আস্তিক মুমীন হওয়া সত্বেও এরা কোরআনে—হাদিসে নিষিদ্ধ কর্মে-খুনে রাহাজানিতে, জুয়ায় জোচুরিতে, মস্তানীতে, গুণ্ডামীতে, চুরিতে, মিথ্যাভাষণে-ছল-চাতুরী-প্রতারণায় ও লাম্পট্যে আসক্ত সর্বপ্রকার দোষে কিংবা আন্তরিকভাবে ঘৃণা ও পতিত তথা একঘরে করে না, কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করে বলে বিধর্মীরা ভিন্নমতবাদীদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে।

স্বধর্মী দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতিবাজদের উপদ্রব্য সত্যি মানুষের ব্যক্তিক জান-মাল-গর্দানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও বিনষ্ট করে। বিপন্ন ও বিলুপ্ত করে সমাজের স্বাস্থ্য স্বস্তি। তাদের প্রতি এসব ধর্মপ্রাণ-ধর্মবাজীদের কোন ক্ষোভ-রোষ-বিদ্বেষ ঘৃণা নেই। আহ্‌মদীয়ারা বা কাদিয়ানীরা যদি কুফরী আচারে ও আচরণে আসক্ত হয়, তা হলে তারা আল্লাহ প্রদেয় শাস্তি পাবে, যেমন পাবে কাফের ও অন্যান্য বেদীনেরা। সেজন্যে মুমীনদের এতো মাথা ব্যথা কেন? শায়েস্তা করার এ দায়িত্বই বা তাদের কে দিল? যদি এমন হত যে, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ইহজাতিক অর্থসম্পদে, সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য আসত, কিংবা সমাজে চোর-ডাকাত-ঘুষখোর-লম্পট, প্রতারক, চোরাকারবারী, কালোবাজারী লোপ পেত, তা হলে এ আন্দোলন হত সঙ্গত ও জরুরী। কাদিয়ানীরা অমুসলিম ঘোষিত হলে যদি আমাদের সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি-দর্শন-বিজ্ঞান-বাণিজ্য বিকাশ বিস্তার লাভ করবে জানতাম, তাহলে তাতে আমরা যারা সমৃদ্ধির দাবিদার, আমরাও যোগ দিতাম। এ বৃথা আন্দোলনে অকাজের কাজে কার কি লাভ? বরং একালে এমনি আন্দোলন প্রত্যক্ষে অন্যের চিন্তার ও চিন্তা প্রকাশের তথা ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণের এবং বাকস্বাধীনতার অধিকার হরণরূপ দেশ-কাল-মানবতা বিরোধী অমানবিক চিন্তা-চেতনায় প্রসূনরূপেই সভ্যজগতে ধিকৃত হওয়ার কথা এসব বিপথগামীরা অপরাধ করেছে আল্লাহর কাছে। তাই শাস্তির দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ওরা সুন্নীদের কিংবা সরকারের কাছে কোন অপরাধ করে নি। তাই ওরা শাস্তির দাবিদার বা মালিক হতে পারে।

(অবশিষ্টাংশ ৭০ পাতায় দেখুন)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ধৈর্য

শেখ হেলালুদ্দীন আহমদ

বিশ্ব বরেণ্য একজন তফসীরকারকের শৈশব কালের একটি ঘটনা দিয়ে শুরু করছি। তিনি পরবর্তী কালে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফারূপে অভিসিক্ত হন। তিনি ছিলেন মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র ও প্রতিশ্রুত সংস্কারক। শিশুরা স্বভাবতঃ নিষ্পাপ হয়ে থাকে। তারা মিথ্যে ও পাপ পুণ্যের সাথে সম্পর্কহীন থাকে। একদা শৈশবে হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুস্‌লেহুল মাওউদ (রাজিঃ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খেলাচ্ছলে আগুন ধরিয়ে পুড়ে ফেললেন। এ ঘটনার পর বাড়ীর সকলেই বিশেষ করে শিশুর মাতা উম্মুল মোমেনীন, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সকলেই বলা বলি করতে লাগলেন যে, এখন কি করা যায়? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বাড়ী এসে যখন এ ঘটনা জানতে পারবেন, তখন না জানি তিনি কি বলবেন ও কতনা ভর্ৎসনা করবেন। কতক্ষণ পরে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন বাড়ীতে তশ্‌রীফ আনলেন, তখন বাসাস্থ সকলের চেহারায় মলিন ও থমথমে ভাব দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন:

আজ তুম লোগুমে কিয়া হোগিয়া, সবকো গমগীন মালুম হুতাহে কেঁও, অর্থাৎ অদ্য তোমাদের কি হয়েছে যে, সকলকেই চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছে?

এ প্রশ্নের জবাবে, (বিবি সাহেবা) উম্মুল মুমেনীন ভয়ে ভয়ে বললেন, বশীর আপনার একটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আগুন ধরিয়ে পড়িয়ে ফেলেছে। এ ঘটনার কথা শুনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হাসতে হাসতে বললেন, এই ব্যাপার? তাতে তেমন কি ক্ষতি হয়েছে? হুতে পারে, আল্লাহ আমার দ্বারা উহার চাইতে আরও উত্তম কিছু লিখাবেন। আরও বললেন, আল্লাহতা'লা মোমেনদের জন্য যা করেন, কল্যাণের জন্যই করেন। এই তো ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর, ধৈর্য, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও আল্লাহ্ নির্ভরতা। পবিত্রাত্মাগণ সর্বাবস্থায় এসব গুণাবলী প্রদর্শন করে থাকেন। ধৈর্য, নম্রতা ও আল্লাহ্ নির্ভরতা সর্বদা তাঁদের প্রতি পদক্ষেপকে পরিচালিত করে অবিচলভাবে। অধৈর্য, নৈরাশ্য ও রাগারাগি ইত্যাদি দোষ তাঁদেরকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না।

একটি প্রশংসনীয় মন্তব্য

.....এর পরে মুক্তিবুদ্ধির, নির্মোহ দৃষ্টির সৎ সাহসের এবং কাল সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন আহমদীয়ারা ওরফে কাদিয়ানীরা এ শতকে। আহমদীয়াদের মধ্যে ব্রাহ্মদের মতোই অনক্ষর লোক নেই। এ মতবাদ হচ্ছে ধীর বুদ্ধির ও স্থির বিশ্বাসের শিক্ষিত মানুষের। আজ ঢাকার রাজনীতিক মতলব দুষ্ট লোকেরা আহমদীয়াদের এতো কাল পরে অকারণে অমুসলিম বলে ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে সরকারের কাছে।

বোধ হয়, জামা'ত, তবলীগ, খানকা-দরগাহওয়ালারা ও কেরামত বুজুরগীর ভেলকীবাজ পীরেরা তাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরূপতার প্রতিকার হিসেবেই গণদৃষ্টি কাদিয়ানীদের দিকে ফেরানোর বৃথা প্রয়াসী মাত্র।..... ।

(মন্তব্য করেছেন, জনাব আহমদ শরীফ, ১/২/৯২ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

ইদানিং স্থাপিত চট্টগ্রাম জামা'তের ফোন নং নোট করুন: ২০৯২১১

সংবাদ

আখবারে আহমদীয়া

লোক মারফত খবর পাওয়া গিয়েছে যে, হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কাদিয়ানের শততম সালানা জলসা শেষে গত ১৬ই জানুয়ারী লণ্ডন গিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর স্বাস্থ্য আল্লাহতা'লার ফযলে ভাল আছে। তিনি সমগ্র বিশ্বের জামা'তের ভাইবোনদেরকে প্রীতিপূর্ণ আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু-এর তোহ্‌ফা প্রেরণ করেছেন। হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনের জন্যে সকলে সদা দোয়া জারী রাখবেন।

অদ্য রাত ৬-৩০ মিঃ (২৯-১-৯২)-এর সময়ে জাপান থেকে টেলিফোন মারফত সেখানকার মিশনারী ইনচার্জ সাহেব জানালেন যে, হুযূর (আইঃ)-এর বেগম সাহেবা পিত্ত পাথরী রোগে আক্রান্ত। আজ লণ্ডনে তার অপারেশন হবে। অপারশনের সফলতা এবং বেগম সাহেবার পূর্ণ আরোগ্যের জন্যে বিশ্বের সকল আহমদী ভাইবোনের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

গত ২৯-১-৯২ তারিখ জাপানের মাধ্যমে পুনরায় খবর পাওয়া গেছে যে, বেগম সাহেবার অপারেশন সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি সুস্থ আছেন। বন্ধুগণ দোয়া জারী রাখবেন।

আহমদী বার্তা

স্থানীয় জলসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

সকল জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবানের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় জামা'ত-সমূহের সালানা জলসা কেন্দ্রীয় সালানা জলসা '৯২ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হইবে—ইনশাল্লাহ্। ইতিমধ্যে যে সকল জামা'ত আমাদের কেন্দ্রীয় জলসার পূর্বেই তাহাদের জলসা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করতঃ কেন্দ্রে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদেরকে পুনরায় নূতন তারিখ নির্ধারণ করতঃ কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ করার অথবা কেন্দ্রীয় জলসা চলা-কালীন সময়ে ব্যক্তিগতভাবে থাকসারের সহিত যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ন, ন, মোহাম্মদ সালেক
চেয়ারম্যান
স্থানীয় জলসা তদারকী কমিটি—'৯২

প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে অত্যন্ত শান ও শওকতের সহিত গত ১০/১/৯২ ইং রোজ শুক্রবার আঃ মুঃ জাঃ ক্ষুদ্রপাড়া-এর ১ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি অধিবেশের মধ্য দিয়ে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। বাদ জুমুয়া বেলা ২-৩০ ঘটিকার সময় জলসার প্রথম

অধিবেশন শুরু হয়। ১ম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন প্রেঃ আঃ মুঃ জাঃ ভাতগাঁও জনাব মোসলেম উদ্দিন আহমদ সাহেব। বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব ডাঃ ইসমাইল হোসেন সাহেব, মৌঃ আমীর হোসেন সাহেব (মোয়াল্লেম), মৌঃ আহসান উল্লাহ্‌ পাটোয়ারী সাহেব (মোয়াল্লেম), মৌঃ মাহমুদ আহমদ আনসারী সাহেব (মোয়াল্লেম) এবং মাওঃ বশিরুর রহমান সাহেব (সদর মুরব্বী)। বাদ মাগরেব জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনেও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মৌঃ মাহমুদ আহমদ আনসারী সাহেব (মোয়াল্লেম)। আবুল হাসেম মাষ্টার সাহেব আহমদ নগরী। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষ থেকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন মোহতারম মাওঃ বশীরুর রহমান সাহেব (সদর মুরব্বী)। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম ইজতেমা সুসম্পন্ন

আল্লাহ্‌র ফযলে মঃ খোঃ আঃ চান্দপুর বাগান-এর উদ্যোগে স্থানীয় ১ম বার্ষিক ইজতেমা ১০/১/৯২ সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্‌। তাহাজ্জুদ নামাযের পর ইজতেমার কাজ শুরু হয়। খোদ্দামের পতাকা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মাওলানা ফিরোজ আলম ও জনাব আবুল হাশেম। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। তারপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পর জুমুয়ার নামায শুরু হয়। জুমুয়ার নামাযের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। এতেও সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। সদর সাহেবের বাণী পাঠ করে খাকসার। বক্তব্য রাখেন মাওলানা ফিরোজ আলম, আব্দুস সালাম (কুমিল্লা), জনাব আবুল হাশেম, মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের (মোয়াল্লেম)। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব ইকবাল চৌধুরী। সভাপতির ভাষণের পর পুরস্কার বিতরণ, দোয়া ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। এতে ইটামলা, লাদিয়া, জামালপুর থেকেও খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন। মোট লোক সংখ্যা ছিল ৫০ জন।

মোঃ আনোয়ার চৌধুরী, কায়েদ
মঃ খোঃ আঃ চান্দপুর বাগান

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরীর বক্তৃতা

গত ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় ঢাকায় রামকৃষ্ণ আশ্রমে 'যুব নায়ক বিবেকানন্দ' বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরীও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে যে জাতির সংশোধন হতে পারে না তা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আমাদের চার পাশের ঘটনাবলীই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি বলেন যে, স্বামীজি বলেছেন, ঘরে বসে অলসভাবে গীতা পাঠের চাইতে যদি

যুবকরা খেলার মাঠে গিয়ে স্বাস্থ্যকর খেলায় অংশ নেয় তাহলে তা উৎকৃষ্ট কাজ হবে। বিবেকানন্দ আরো বলেছেন যে, এই উপমহাদেশের উন্নতি নির্ভর করে ইসলামীয় দেহে বৈদান্তিক মস্তিষ্ক স্থাপনের মধ্যে। ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মিলন ও সহ অবস্থান এ পথেই সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হলেও এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। জনাব চৌধুরী বলেন, আল্লাহর রাজত্বে যেমন জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে তেমনি বাংলাদেশেও সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান অধিকার ভোগ করবে। আর এটাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। এই অনুষ্ঠানে বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য অধ্যাপক প্রভাকর পুরকায়স্থ ও স্বামী অক্ষরানন্দসহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের টি, ভিতেও প্রদর্শিত হয়। —আহমদী বার্তা

কাদিয়ানী বিতর্ক

নোবেল পুরস্কার পেলে কাদিয়ানীও মুসলমান হয়ে যায়!

"কাদিয়ানী বিতর্ক প্রতিবেদন পড়ে এ বৃদ্ধ বয়সে আমার শিহরণ জাগলো। তাই ভাবলাম সাম্প্রদায়িকতার কুকীর্তি সাপ্তাহিক সুগন্ধার মাধ্যমেই প্রকাশ করা হউক।

হিংসা-বিদ্বেষ আর দুষ্ট স্বার্থ-বুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত কিছু সংখ্যক মোল্লার ভ্রান্ত চিন্তা-ধারার কারণে মানব জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে এবং এর প্রভাবে সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা অহরহ লেগেই রয়েছে।

বাংলাদেশেও সক্রিয় রয়েছে মৌলানা মওদুদীর সক্রিয় অনুসারীরা। '৭১ সালে ধর্মের নামে যারা হত্যা, ধর্ষণ করেছিল, স্বাধীনতার ২০ বছর পর আজ আবার তারা মাঠে নেমেছে। এর উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। মুসলিম-অমুসলিম নিয়ে অকারণে বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধ্বংস ডেকে আনা।

বাংলাদেশকে যারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র কিংবা রাজা-প্রজার মাধ্যমে দেশ চালাতে চান তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বা খোলাফায়ে রাশেদীনেরা কি তাদের অঞ্চলকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন? ইসলামে কি রাজা-প্রজা আছে?

পাকিস্তানে কাদিয়ানী অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে সেটা পাকিস্তানের ব্যাপার। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, পদার্থ বিজ্ঞানী আবদুস সালাম '৭৯ সালে যখন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন করাচীর 'ডন' পত্রিকায় ১৯৮০'র ৫ই মার্চ পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করেছিল, পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হচ্ছেন ডঃ আবদুস সালাম। কাদিয়ানীরা অমুসলিম। তাহলে আবদুস সালামকে কী করে মুসলমান বলা হলো। সত্যিই কী বিচিত্র পাকিস্তানের এই মন গড়ানো ইসলাম। নোবেল পুরস্কার পেলেই যে মুসলমান হওয়া যায়, এটা কি ধরনের ইসলামী আইন?"

মাসউদুল হক
মেডিকেল অফিসার, ষোলশহর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

'অন্তর চিরে দেখেছ তারা মুসলমান কি-না?

"সাপ্তাহিক সুগন্ধায় গত ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যায় কাদিয়ানী বিতর্ক শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়েছি। প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। এ বিতর্ক আর মোটেই এগুতে দেয়া উচিত নয়। কাদিয়ানীদের নিয়ে এ ধরনের বিরোধ নতুন নয়। এ ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে অহেতুক বিতর্ক পাকিস্তান আমলেও হয়েছে। এতে লাভের মধ্যে যা হয়েছে, সেটা হলো মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যে কারণে উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিযোগে বিচারপতি মুনীর, মাওলানা মওদুদীর ফাঁসির আদেশ দেন। পরে অবশ্য চাপের মুখে সেটা বাতিল হয়ে যায়।

আমার মতে ধর্ম হচ্ছে অন্তর এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপার। পবিত্র কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন, ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি কিছু নেই। এ কথা মেনে নিলে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার এখতিয়ার কারো নেই। কাদিয়ানী সম্প্রদায় যদি ক্ষতিকর কিছু করে থাকে পাশাপাশি নিজেদের মুমীন মুসলমান বলে দাবি করে তবে ইসলামের দৃষ্টিতে কিছু না বলাই শ্রেয়ঃ।

কারণ আমরা হাদীস শরীফ থেকে জেনেছি, এক যুদ্ধে বিরোধীরা মুসলিম সৈন্যদের হাতে পরাস্ত হয়ে বারবার কলেমা পড়ছিল এবং 'আমি মুসলমান' বলে দাবি করছিল তা সত্বেও সাহাবীরা তাদের হত্যা করে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের মুখে একথা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি সাহাবীদের প্রশ্ন করেন তোমরা কি তাদের অন্তর চিরে দেখেছিলে? কি করে বুঝলে তারা মুসলমান কি-না? সুতরাং এ নিয়ে হৈ-চৈ করার অর্থ দেশের অস্থিতি ডেকে আনা। যা আমাদের কারো জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে না।"

খালিদ আহমেদ সিরাজী
নাসির আহমেদ সিরাজী
সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম

খোদ্দামের জ্ঞাতব্য

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৯১-১৯৯২ সনে নিম্নলিখিত ৬ (ছয়) জন রিজিয়নাল কায়েদ ও ১৬ জন জেলা কায়েদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে:

রিজিওনাল কায়েদ

১। ঢাকা	:	জনাব আবু তাহের ঢালী (এন-গঞ্জ)
২। চট্টগ্রাম	:	,, শফিউল আলম বরকত (বি-বাড়ীয়া)
৩। রাজশাহী-১	:	,, কে, এম, মাহবুবুল ইসলাম

৪। রাজশাহী-২	:	,,	মমিনুর রহমান (রাজশাহী)
৫। খুলনা	:	,,	মোহাম্মদ শামসুর রহমান (খুলনা)
৬। বরিশাল	:	,,	লুৎফর রহমান (খাকদান)

জিলা কায়েদ

১। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ	:	,,	মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (ঢাকা)
২। এন-গঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ	:	,,	এনামুল হক ভূইয়া (ঢাকা)
৩। জামালপুর, টাঙ্গাইল	:	,,	মোস্তফা বাবুল (সরিষাবাড়ী)
৪। কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম	:	,,	আবদুস সালাম (কুমিল্লা)
৫। বি-বাড়ীয়া, সিলেট, হবিগঞ্জ	:	,,	মোস্তাক আহমদ খন্দকার (বি-বাড়ীয়া)
৬। ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়	:	,,	আবদুল মাওলা (আহমদনগর)
৭। দিনাজপুর	:	,,	নূরউদ্দীন আহমদ (ভাতগাঁও)
৮। রংপুর ও শ্যামপুর	:	,,	নজমুল হক (শ্যামপুর)
৯। নীলফামারী ও সৈয়দপুর	:	,,	মোহাম্মদ ওমর আলী (সৈয়দপুর)
১০। বগুড়া, নাটোর, পুরুলিয়া ও মহারাজপুর	:	,,	তাহমীদুল হাসান (বগুড়া)
১১। পাবনা, ঈশ্বরদী, পাকশী ও নূরনগর	:	,,	তারেক আহমদ চৌধুরী (রাজশাহী)
১২। উল্লাপাড়া, কয়ড়া, এরশাদনগর ও বনওয়ারী নগর	:	,,	আবুল কালাম আযাদ (পাকশী)
১৩। রাজশাহী, কাফুরিয়া ও তাহেরাবাদ	:	,,	শহীদ হোসেন খান (রাজশাহী)
১৪। বৃহত্তর খুলনা ও যশোর	:	,,	হাসিব আহসান (খুলনা)
১৫। বৃহত্তর কুষ্টিয়া	:	,,	মামুনুর রশিদ (নাসেরাবাদ)
১৬। বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা	:	,,	জালাল আহমদ (পটুয়াখালী)

মোহাম্মদ আবদুল হাদী

সদর, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া,
বাংলাদেশ

শুভ বিবাহ

আল্লাহতা'লার অশেষ রহমত ও বরকতে আমার প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ সায়ীদা আক্তার সারমিনের বিবাহ গত ২৭-১২-৯১ তারিখ বাদ জুমুয়া ২৪নং মিশন পাড়া আহমদীয়া জামে মসজিদে মুন্সীগঞ্জ মরহুম মেহের আলী মাষ্টারের ২য় পুত্র পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মোঃ কামাল পাশার সহিত ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা দেন মোহরে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের খোৎবা প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মোয়াল্লিম ডাঃ মৌঃ আ. কাসেম আনসারী এম বি এইচ সাহেব। আল্লাহ পাক যেন উক্ত বিবাহ উভয় পরিবারের জন্য বাবরকত করেন জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী ও বুযুর্গানে কেরামগণের খেদমতে খাস দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

আনোয়ার আলী
সেক্রেটারী বাংলাদেশ
হোসিয়ারী সমিতি, নারায়ণগঞ্জ

দোয়ার আবেদন

আমার আব্বা ডাঃ মোহাম্মদ জারজিস আলী, চুয়াডাঙ্গা একজন মোখলেস আহ্‌মদী। তিনি দীর্ঘ ৫ বৎসর যাবৎ শয্যারত অবস্থায় আছেন। বহু চিকিৎসায়ও তিনি আরোগ্য লাভ করছেন না। সকল আহ্‌মদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ নাতেকুর রহমান
চুয়াডাঙ্গা

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, তারুয়া নিবাসী মরহুম মোঃ তাইজুদ্দিন আহমদ এর স্ত্রী মোছাঃ জোবেদা খাতুন দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ১২-১-৯২ইং রোজ রবিবার দুপুর ২-৪০ মিঃ ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না.....রাজেউন) মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭০ বৎসর তিনি ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন। মরহুমার আত্মার মাগফেরাত ও তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য ধারণের জন্য সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

খুশী
তেরগাতী জামা'ত

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অন্তরে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একজন নিষ্ঠাবান মুয়াল্লিম মরহুম মৌলভী নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের স্ত্রী মুসাম্মাৎ জিন্নাতুন নেসা খানম ২৩শে জানুয়ারী '৯২ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র ৪ ঘটিকায় আহমদনগরে ইন্তেকাল করেছেন, (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর ছিল।

মরহুমা অত্যন্ত দীনদার, পরহেযগার, আল্লাহ্‌র উপর আস্থাবান এবং জামা'তী কাজে পরম উৎসাহী ও উদ্যোগী মহিলা ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি লাজনা ইমাউল্লাহ আহমদনগরের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিরলস সেবা করেছেন। আহমদনগরের মহিলাদিগকে দেয়া তাঁরই তা'লীম ও তরবীয়তের সুস্বাদু ফল আমরা এবার খেয়েছি, যখন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধী শক্তি মৌলভীগণ ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সৈয়দপুর ও আশপাশ হতে দলে দলে পঞ্চগড় একত্রিত হলেন এবং উহার চতুর্দিকে ২৫ মাইল পর্যন্ত রিকশা ও গাড়ীতে মাইকিং করলেন। সভা করে ঘোষণা দিলেন যে, অমুক শুক্রবারে আমরা আহমদনগরের আলীশান মসজিদ দখল করে উহাতে নামায আদায় করবো, তখন আহমদনগরের বীর মহিলারা নিজেদের যুবক সন্তানদিগকে মসজিদের হিফাযতের জন্য পাঠালেন এবং তাদেরকে বলেন, বাবা সোনারা যাও তোমরা, যে কোন মূল্যে তোমরা মসজিদের হিফাযত করবে দরকার হলে জীবন দিবে। কিন্তু যদি তোমরা মসজিদ হারা হয়ে বাড়ী ফির তাহলে আমরা তোমাদিগকে মারবো,

তোমাদেরকে ঘরে স্থান দিবো না, শিশুকালে তোমাদিগকে যে দুধ পান করিয়েছি উহার দাবীও ছাড়বো না। সেদিন মহিলারাও মসজিদে তাদের নির্ধারিত স্থানে এসে অবস্থান নিল। বৈরী শক্তি চিরতরে ব্যর্থ হল।

তিনি দুই কন্যা পাঁচজন নাতী-নাতনী এবং বহু গুণগ্রাহী স্বজন ছেড়ে গেছেন। সকল ভাই বোন মরহুমার জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত ও বুলন্দীয়ে দরজাত কামনা করবেন এবং শোক সন্তপ্ত সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহতা'লা তাদেরকে সবরে জমীল দান করুন এবং তাদের হাফেয নাসের হোন, আমীন। খাকসার

মরহুমার ভাগিনা, মাওঃ আবদুল আযীয সাদেক

একটি করুণ মৃত্যু

তারুয়া নিবাসী জনাব আমীরুল হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জনাব ইব্রায়েতুল হাসানের ভাতিজা জনাব মনিরুল হাসান (সবুজ) গত ২রা ফেব্রুয়ারী '৯২ রাত ১১-৩০ মিঃ সময়ে নয়াটোলাস্থ বাসার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। মরহুমের অকাল মৃত্যুতে তাঁর পরিবার তথা সমগ্র জামা'তের ওপর শোকের ছায়া নেমে আসে।

আল্লাহতা'লা যেন এ যুবকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত দান করেন এবং তাঁর পরিবারের সকলকে দান করেন সাবরে জামীল সেজন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস তাবে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। পরের দিন বেলা সাড়ে তিনটার সময় দারুত তবলীগে জানাযার নামাযের পর মরহুমের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ী তারুয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আহমদী বার্তা

(৬২ পাতার পর)

দেশের ও সমাজের এমনি অবস্থায় জ্ঞানী-বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান লোকেরা পরামর্শ দেন, 'আপন চরকায় তেল দাও।'—এরূপকার্থক বাক্যে। যেখানে নিজের স্বধর্মীর মধ্যেই শতকরা নিরানব্বইজন লঘু—গুরুভাবে দুরাচারী স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছায় পাপাসক্ত, সেখানে হিন্দু—বৌদ্ধকে কাফের আর কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে ঘৃণ্য শত্রু ভেবে লাভটা কি? কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে ঘোষণা করলেই ওরা মর্ত্য মাটি থেকে কিংবা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হবে না—যেমন হয় নি পাকিস্তানে, তবু ওখানে চাকুরী ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু সুন্নীদের কিছু ফায়দারটার কারণ ঘটেছে। কিন্তু এখানে সেগুড়ে বালি, ওদের সংখ্যা এতো নগণ্য যে বকশী বাজারে না গেলে ওদের অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না। তবুও বছর দুই আগে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আহমদীয়াদের পাড়ায় আগুন দেয়া হয়েছিল। তাতে ওদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু ইমান টলে নি। তাই বলছি অকাজের কাজ ছাড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা বাংলা দেশে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন অনেকটা ডনকুইকসোটি হাওয়াই লড়াই মাত্র। এতোকাল যদি এদের সঙ্গে নির্বিবাদে সহাবস্থান করা সম্ভব হয়ে থাকে। এখন সম্ভব না হওয়ার কোন বাস্তব ও সঙ্গত কারণ দৃশ্য নয়।

তাহলে কোন্ স্বার্থে কোন রাজনীতিক দল কোন্ মতলব হাসিলের লক্ষ্যে অকালে অসময়ে আকস্মিকভাবে 'কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা কর' শ্লোগান দিচ্ছে।

(সাপ্তাহিক "প্রয়োজন" এর ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯২ সংখ্যার সৌজন্যে)

যে কত মিথ্যা রটনা করেছে তা শ্রবণ করলে কানে হাত দিতে হয়। প্রত্যেক ইসলামের ইতিহাস পাঠকই তা অবগত আছেন।

অধুনা কালের নায়েবে রসূল আওলাদে রসূল বলে কথিত কতিপয় ব্যক্তি আহমদী জামা'তের বিরোধিতাকালে এথেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ইতোপূর্বে আমরা এ প্রসঙ্গে কয়েকবার লিখেছি। কয়েকদিন পূর্বে সিলেটে তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবুওয়ত সংস্থা আয়োজিত সভায় এ ধরণের কতিপয় মিথ্যা উক্তির প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

(১) "কিন্তু কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে মীর্জা গোলাম আহমদ নামের পাকিস্তানী একজন জারজ (নাউযুবিল্লাহ —সম্পাদক) সন্তানকে তারা নবী হিসেবে মানে"— দৈনিক সিলেট বাণী, ১লা মাঘ, ১৩৯৮ এর সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যিনি পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি কিভাবে, 'পাকিস্তানী' হলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। সন তারিখ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান যেসব ওলামায়ে কেরামের নেই তারা কিভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌কে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

(২) "উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম আওলাদে রসূল হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী কাদিয়ানীদের বিপথগামী বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, কাফের সর্দার আবু জাহেল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করলেও মুরতাদ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তা স্বীকার করেনি।" (দৈনিক সিলেটের ডাক, ১লা মাঘ, ১৩৯৮ দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত বক্তব্য যে কতখানি নির্জলা মিথ্যা তা ইতিহাস সম্বন্ধে যারা সবে মাত্র পড়াশুনা আরম্ভ করেছে তাদের কাছেও ধরা পড়বে। আবু জাহল হুযুর পাক (সাঃ)-কে সত্য নবী বলে স্বীকার করলে সে আবু জাহল না হয়ে আবুল হেকামই থাকত আর বদরের প্রান্তরে নির্মম লাঞ্ছনার মৃত্যুর শিকার হত না ; বরং তার নামের প্রথমে হযরত এবং শেষে (রাঃ) লেখা হতো। ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুযায়ীও এই উক্তি ঠিক নয়। কেননা আয়াতে খাতামান্নবীঈন নাযেল হয়েছে আবু জাহলের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে। যিনি এ কথা প্রচার করেছেন তাহলে এখন থেকে তিনি কি আবু জাহলকে ঐ দৃষ্টিতেই দেখতে আরম্ভ করবেন? নাউযুবিল্লাহ (এথেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি) কথায় বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

এসব বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা শুধু বলি ঃ লানাতাল্লাহে আলাল কাযেবীন।

15th Febuary, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan